বিভীষিকার দেশে

রথীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
শ্রীঅরুণ কুমার পুরকায়স্থ
শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা ৯

এপ্রিল
১৯৩৭

মূল্য—দুই টাকা

মুদ্রাকর :
শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ভৌমিক
রুবী প্রিন্টিং হাউস
৪০/১বি, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন
কলিকাতা-১২

বিভীষিকার দেশে

- এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ :
- পেরুর প্রান্তরে
- টাইমারের জঙ্গলে
- সপ্তডিঙার রত্নদ্বীপ
- মুক্তিযুদ্ধে রণদা

রণদাসহ নাংওয়ানামাশালার আবির্ভাব

একে গ্রীষ্মের ছুটি তায় রবিবার। আসর তাই জমজমাট ছিল। সদস্যরা বলতে গেলে সকলেই হাজির। কেউ ক্যারম খেলছে, কেউবা টেবিল-টেনিস। আরও অনেকে এদিক-ওদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। আমি, মণ্টু, অজয় আর শম্ভু এক কোণায় বসে সিনেমার গল্প করছি। শম্ভু মাঝখানে একদিন 'কিডন্যাপড্' দেখে এসেছে। এ্যালান ব্রেক আর ডেভিড বেলফ্যুর সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করছি। এমন সময়ে বজ্র এসে হাজির। হাঁপাতে হাঁপাতে এসেছে। দেখে মনে হয়, বেশ উত্তেজিত। এসেই আমাদের মাঝে এসে বললো, "চন্দ্রদা, শম্ভুদা, তাড়াতাড়ি চল। রণদা ডাকছেন।" আমি অনেকটা অবাক হয়ে বজ্রকে বললাম, "মাথা খারাপ হয়েছে নাকি রে? কাল সকালবেলাতেই তো রণদার চিঠি পেয়েছি। মরিশাস থেকে লিখেছেন। আর আজকেই একেবারে বাড়িতে?" বজ্র এবার বেশ মেজাজ দেখিয়েই বললো, "সব ব্যাপারে ইয়ার্কি আদৌ পছন্দ হয় না। আমি তোমাদের থেকে এক ক্লাস নীচুতে পড়ি। তার মানে কি এই যে তোমরা আমাকে যখন-তখন পাগল-ছাগল বলবে? আমি ক্লাবে আসছিলাম। রণদা জানালা থেকে আমাকে ডেকে বললেন, 'এই বজ্র। সবাইকে ডেকে নিয়ে আয়।' তোমরা না যাও তো

বলো। আমি রণদাকে খবরটা দিয়ে আসি"। আমি শম্ভুর মুখের দিকে তাকালাম। ওর মুখে অবিশ্বাসের হাসি। অজয় কিন্তু বললো, "চল্ না, দেখেই আসি। মিথ্যে হলে চামড়া খুলে নেবো।" এর মধ্যে ক্যারম আর টেবিল-টেনিস খেলা বন্ধ হয়েছে। লাইব্রেরীর বই নেওয়াও বন্ধ হয়েছে। সকলেই আমাদের পাঁচজনকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। রণদার নাম কানে গেছে—আর কি কেউ স্থির থাকতে পারে? রণদা হচ্ছেন সেই ধরণের বাঙ্গালী যারা বিশ্বের নাগরিকত্ব দাবী করতে পারেন। পয়সার অভাব নেই—গুণেরও অভাব নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রীর অধিকারী রণদা বিজ্ঞানের মাধ্যমে জ্ঞানারোহণের পথকেই মেনে নিয়েছেন। পৃথিবী ঘুরে বেড়ানো তাঁর নেশা। পৃথিবীর গুণীসমাজের তিনি প্রিয়পাত্র। বিশ্বাসঘাতক ইনকা জোরিণোর কবল থেকে বিজ্ঞানী আলভারেজকে মুক্ত করে আনার পর রণদার নামডাক আরও বেড়েছে।* বছরখানেক আগে আর্জেনটিনা থেকে রণদার একটা চিঠি পেয়েছিলাম। চিঠিতে তিনি অনেক মজার কাহিনী লিখেছিলেন। দি ইউ. এস. বীভারস্ সোসাইটি তাঁকে টাকা দিয়ে আর্জেনটিনাতে পাঠিয়েছিলো। চিঠিটা এরকম ছিল—"আমার ডানপিটে সঙ্গীর দল, আর্জেনটিনার রেজিসটেনসিয়া থেকে চিঠি লিখছি। এখান থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে প্যারাগুয়ে। আগামী সপ্তাহে ফরমোসা হয়ে ওদেশের ভিলারিকাতে যাবো। ফরমোসা কিন্তু চীনদেশের বিখ্যাত জায়গা নয়—

---

* "পেরুর প্রান্তরে" দ্রষ্টব্য।

এদেশের ছোট্ট একটা জায়গা। আমার তাঁবুর কাছেই পারানা নদী বয়ে চলেছে। পরমা বললেও ক্ষতি হয় না। এত চমৎকার নদী বড় একটা দেখা যায় না। আমেরিকার বীভারস্ সোসাইটি —যার পোষাকী নাম দি ইউ. এস. বীভারস্ সোসাইটি—আমাকে বীভারদের ব্যবহার জানবার জন্য পাঠিয়েছে। তোরা অনেকেই জানিস্ যে বীভার ইঁদুরের মতোই—তবে একটু বড়ো। এই জন্তুকে পৃথিবীর প্রথম ইঞ্জিনীয়ার বলা হয়। এরা দাঁত দিয়ে বড়ো বড়ো গাছ কেটে ফেলে আর তা এমন চমৎকার ভাবে সাজিয়ে জলের মধ্যে ফেলে যে গাছ দিয়েই সুন্দর বাঁধ তৈয়ারী হয়ে যায়। এরা গাছের ডালগুলি কেটে ফেলে আর সেগুলিকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে বড়ো বড়ো গাছের ওপর রাখে। গাছের পাতা আর বাকল এরা খেয়ে ফেলে। এদের ক্ষমতার তুলনা হয় না।

বীভার পরিবারের হ্যামস্টার থাকে জার্মানীতে। তাদের লক্ষ্য করা শেষ করে রাশ্যার সাইবেরিয়া থেকে চিপমাংক ধরেছি। সেখান থেকে নর্থ আমেরিকা আর কানাডার বিভিন্ন জায়গা ঘুরে আর্জেনটিনার প্যামপাস-এ এসেছি। এ জায়গার ভিসকাছার সাথে একটা মজার গল্প জড়িত রয়েছে। ডারউইনের নাম তোরা শুনেছিস্। ওঁর এক বন্ধুর একটা ঘড়ি হারিয়ে যায়। ভদ্রলোক পুলিশ-টুলিশ না করে সরাসরি ভিসকাছাদের গর্তে হাত ঢুকিয়ে দেন। সেখানে তিনি হাড়গোড়ের মধ্যে নিজের ঘড়িটাকেও খুঁজে পান। বীভারদের মধ্যেও শ্রেণীভেদ রয়েছে। হ্যামস্টাররা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন—এরা চুরীটুরী পছন্দ করে না। ভিসকাছারা

কিন্তু দারুণ চোর। এরা যা পায় তা-ই চুরী করে ঘরে নিয়ে রাখে।" এ চিঠি পাবার পর আমরা স্কুলের মাষ্টারমশাইকে বীভার সম্বন্ধে কিছু বলতে বলেছিলাম। তিনি আমার কান মুলে দিয়ে বলেছিলেন—"ডেঁপো ছেলে, সিলেবাসে যা নেই তা-ও কি আমাকে বলতে হবে? আমাকে তোমরা ক'টাকা মাইনে দাও শুনি?" অক্ষমতাকে ঢাকবার নগ্ন প্রয়াসকে আমরা ভালভাবে নিতে পারিনি। আর ঠিক সে কারণেই রণদাকে আমরা ভালবাসি। তিনি অক্ষম বাঙ্গালী নন।

আমরা সবাই দল বেঁধে রণদার বাড়ি গেলাম। দল তো আর কম নয়—জনা পঞ্চাশেক। রণদা বোধহয় দূর থেকেই হৈ-চৈ শুনতে পেয়েছিলেন। বাড়ির কাছাকাছি যেতেই দেখি তিনি দরজায় দাঁড়িয়ে। তাঁর পেছনে সমস্ত দরজাটা জুড়ে যে লোকটা দাঁড়িয়ে রয়েছে তাকে কালোপাহাড় বা দৈত্য বললেই বোধহয় ঠিক মানায়। লম্বায় প্রায় সাড়ে ছ'ফুট—চওড়ায় আমাদের ছ'সাতজনের সমান। রণদার চেহারা নিতান্ত খারাপ নয়। কিন্তু এ লোকটা যেন তাকে দু' আঙ্গুলে তুলে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে। আমরা ভয়ে পিছিয়ে যেতেই রণদা হাঁক ছাড়লেন—"ওরে বোকার দল, ফিরে আয়। ভয় কিসের?" আমরা গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে গেলাম। কারুর মুখেই হাসি নেই। এসব দেখে দৈত্য নিজেই এগিয়ে এলো। হাত বাড়িয়ে সে বললো "গুড্ ইভনিং চিলড্রেন। কাম ইনসাইড।" আমি ক্লাসের ফার্স্ট বয়। উত্তর দেবার দায়িত্ব আমার। কোনও মতে হাত বাড়িয়ে বললাম, "থ্যাংক য়্যু।" লোকটা হো-হো করে

হেসে বললো, "ছ্যাটস্ রাইট। কাম্ ইন্।" রণদা বললেন, "হাউ ক্যান দে?" লোকটা প্রথমে বুঝতে পারেনি। তারপর নিজের দেহ মনে করে আবার হেসে উঠে বললো, "ও গুডনেস্" আর সঙ্গে সঙ্গে সরে গিয়ে রাস্তা করে দিল। আমরা এক এক করে ভেতরে ঢুকলাম।

রণদার বৈঠকখানা আকারে ছোটখাট সিনেমাহলের সমান। রণদার মামা ধনী জমিদার ছিলেন। এসব বাড়িঘর রণদা তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছেন। মাটিতে ফরাস পাতা। চেয়ার-টেবিলের বালাই নেই। আমরা জায়গা নিয়ে বসামাত্র মোক্ষদামাসী একটা গামলার মধ্যে মুড়ি নিয়ে এলো। সঙ্গে চানাচুর। বুঝলাম রণদা আগে থেকেই এসবের ব্যবস্থা করে রেখেছেন আমরা হাত গুটিয়ে বসে রয়েছি দেখে রণদা বললেন, "বুঝলি চন্দ্র, পৃথিবীর এত দেশে ঘুরলাম কিন্তু মুড়ির মত মজার খাবার কোথাও দেখলাম না। আমাদের সভ্যতার এ এক আশ্চর্য অবদান। তা, তোরা আমার লেটেস্ট এ্যাডভেঞ্চারের কথা শুনবি না? হাত চালিয়ে খেতে থাক্। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। এক্ষুনি চারদিক অন্ধকার হয়ে যাবে। তখন বাড়ি যাবার অসুবিধা হয়ে যাবে। আয়, ওর সাথে আলাপ করিয়ে দি। ও তোদের কথা এত শুনেছে যে তোদের দেখেই চিনতে পেরেছে। ওর নাম নাংওয়ানামাশালা। জাতিতে জুলু। দক্ষিণ আফ্রিকার ইস্ট লণ্ডনে থাকে। ওকে নিয়েই আমার এবারকার এ্যাডভেঞ্চার। মাস তিনেক আগে এক আশ্চর্য উপায়ে ওর সাথে আমার আলাপ হয়।

মাস ছয়েক আগে লণ্ডনের একসপ্লোরার্স ক্লাব একটা ছোট্ট

জাহাজ চার্টার করে ও আমাকে আর্কটিক ওশ্যান বা যে জায়গাটাকে আমরা উত্তর মেরু বলি তার কাছাকাছি পাঠায়। আমি আমার পরিচিত পুরোণো জাহাজ "বিজয়াদিত্য" আর তার লোকজনই নিয়েছি। উদ্দেশ্য, পোলার বীয়ার বা ভালুকের হাবভাব লক্ষ্য করা। পোলার বীয়ার ইউরোপ আর আমেরিকা-কানাডার লোকের মনের মতো পশু। আমাদের যেমন রয়াল বেঙ্গল টাইগার। মানুষের বরাবরের ধারণা ছিল যে এই পশুকে বশ করা যায় না। এটা কিন্তু ঠিক নয়। তাছাড়া, এদের মাতৃস্নেহ উল্লেখযোগ্য। একবার একটা জাহাজ থেকে অনেকগুলি ভালুকের বাচ্ছা গুলী করে মারা হয়। এদের মা অন্ততঃ তিনবার ফিরে ফিরে এসে ভালুকগুলিকে গা চেটে দিয়ে আদর করতে থাকে ঘুরে ঘুরে সে এমন শব্দ করতে থাকে যা শুনে বোঝা যায় যে সে কাঁদছে। তারপর তাকেও গুলী করে মারা হয়। সে বাচ্ছাদের গা চাটতে চাটতেই মারা যায়। এরা লম্বায় প্রায় নয় ফুট আর ওজনে ৬০০।৭০০ পাউণ্ড হয়। এদের বোকামো সকলেরই জানা।

আমরা লণ্ডন থেকে যাত্রা করেছি। সেখান থেকে আইসল্যাণ্ডের রেএকজাভিক হ'য়ে গ্রীনল্যাণ্ডের ফ্রেডারিকসডাল গিয়ে দু'রাত কাটিয়েছি। তারপর সেখান থেকে ঘুরতে ঘুরতে প্রুডহোল্যাণ্ড-এ এসেছি। এর পরই লিংকন সী হয়ে নর্থ পোলে ঢুকবো। এই রাস্তা দিয়েই পিয়ারী ১৯০৯ সনে প্রথম মানুষ হিসাবে নর্থ পোলে পৌঁছেছিলেন। জাহাজ নিয়ে মাঝেমাঝেই কেনেডী চ্যানেলের কাছাকাছি ঘুরে আবার ফিরে আসি। তখনও বরফ গলা শুরু হয়নি। অপেক্ষা করতেই হবে। আমরা

আবিষ্কার করতে যাইনি। অভিযাত্রী হিসাবে আগে যা জানা ছিল তা আরও ভালভাবে জানতে গিয়েছি। ফলে অকারণ বিপদের ঝুঁকি নেবার কোনও ইচ্ছা আমার নেই।

সেদিন সোমবার। গতকাল ডাক এসেছে। সেদিন বিলি হলো। এখানে এটাই নিয়ম—সোমবার ডাক বিলি হয়। আমার কাছে অনেকগুলি চিঠি এসেছে। একটা এসেছে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গ থেকে। চিঠিটার লেখক কে তা বোঝা গেল না। কোনও নাম নেই। চিঠিটা এরকম—"কালোকে কালো যদি না দেখে তো কে দেখবে? নাংওয়ানা-মাশালার জীবনের দাম ইস্ট লণ্ডনের হীরের দোকানের সব চেয়ে বড়ো হীরের থেকে কম নয়। কিন্তু ব্যাঙো না এলে বোধ হয় কালাহারির ধূলোর থেকেও কম দামী।" চিঠিটা পেয়ে বেশ কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে রইলাম। কে চিঠি পাঠিয়েছে কি আশা করে পাঠিয়েছে তা বোঝা কঠিন। কেন পাঠিয়েছে তা অবশ্য বোঝা যাচ্ছে। ইস্ট লণ্ডনের কোনও এক নাংওয়ানা-মাশালাকে কালাহারির কোনও জায়গায় আটকে রাখা হয়েছে। আমি গিয়ে তাকে মুক্ত করবো এরকম একটা আশা বোধহয় কারুর রয়েছে। যাহোক, রহস্য ভেদ করা দরকার। বিশেষ করে যখন কালো মানুষ হিসাবে আমার কাছে আবেদন করা হয়েছে তখন চুপ করে ভালুকের ব্যবহার দেখে সময় নষ্ট করা যায় না।

আগামীকাল মঙ্গলবার ভোরেই ডাকবিমানটা লণ্ডন ফিরে যাবে। এক সপ্তাহের মধ্যে সভ্যতার সাথে আর কোনও

যোগাযোগ থাকবে না। আমি তাই রেডিও মারফৎ লণ্ডনে খবর পাঠালাম। আমাকে অন্ততঃ পনেরো দিনের ছুটি দিতে হবে। আমার এক বন্ধু খুব অসুস্থ। তাকে দেখতে যেতে হবে জাম্বিয়াতে। আসল খবরটা অবশ্য চেপে গেলাম। অনেক ধমক-টমক দিয়ে ছুটি মঞ্জুর করিয়ে পরদিন লণ্ডন রওনা হয়ে গেলাম। সেখান থেকে বুধবারই কেপ টাউনের পথে রওনা দিলাম। লণ্ডন থেকে কেপটাউন কাছে নয়—পাকা ছ'হাজার মাইল। কিন্তু এখনকার জেট বিমানের কল্যাণে এই দূরত্বটুকু একদিনেই পেরিয়ে গেলাম।

লণ্ডনে যখন বিমানে উঠতে যাচ্ছি তখন এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেছে। হীথরো বিমানবন্দর ছোট নয়। তাতে ভারতীয়দের আনাগোনাও কম হয় না। কিন্তু আমি কফি কাউণ্টারে যখন কফি খাচ্ছি তখন বিমানবন্দরের একটা লোক আমার হাতে একটা খাম দিলো। তাতে ঠিকানা রয়েছে—'কালোমানিক, হীথরো লণ্ডন।' আমি "কালোমানিক" ঠিকানা দেখেই লেখকের নাম জানতে পেরেছিলাম। পৃথিবীতে একজনমাত্র লোকই আমাকে "কালোমানিক" নামে ডেকে থাকেন। তিনি হিয়েরেনিমো—পেরুর বিখ্যাত স্প্যানিশ বৈজ্ঞানিক। চিঠিতে স্ট্যাম্প ইত্যাদি কিছুই নেই। বোঝা গেল, হাতে করেই দেওয়া হয়েছে। কয়েকটা প্রশ্ন করবার জন্য মুখ তুলে তাকিয়ে দেখি বিমানবন্দরের লোকটা উধাও হয়েছে। চিঠিটা মাত্র এক লাইনের—"জোহানেসবার্গের কার্টার ডায়ামণ্ড কোম্পানীর মিষ্টার ডেভিসের সাথে দেখা করো"।

কেপ টাউন

আশ্চর্য দেশ এই দক্ষিণ আফ্রিকা! সাদা চামড়ার আধিপত্য বজায় রাখবার জন্য পৃথিবীর অন্যান্য সব দেশের আইন-কানুন এখানে তুচ্ছ। শ্বেতাঙ্গরা এখানকার একচ্ছত্র অধিপতি। তাদের জন্য শহর পর্যন্ত আলাদা। তারা যেখানে থাকে তার ত্রিসীমানায় কালো চামড়ার মানুষের প্রবেশাধিকার নেই। তারা যে পথ দিয়ে যাবে তার ছায়া পর্যন্ত কালো মানুষরা পেরিয়ে যেতে পারে না। এই শতাব্দীর সবচেয়ে বড়ো অন্যায় আর অবিচারের প্রতিকারের বিন্দুমাত্র আগ্রহ সভ্যতার ধ্বজাবাহক শ্বেতাঙ্গ ইংরেজ বা আমেরিকানের নেই। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎসাহ পেয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গরা তাই কালো মানুষের উপর দিনদিন অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে চলেছে। তাদের ঔদ্ধত্য অপরিসীম।

আমি এর আগে একবার কেপ টাউনে যাবার আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। কিন্তু ওখানকার সাদা মানুষের অন্ন গ্রহণ করবার কোনও ইচ্ছা না থাকায় আমি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। এবার তাই প্রথম কেপ টাউনে এলাম। বিমান-বন্দরেই শ্বেতাঙ্গদের ব্যবহারে গা রীরী করে উঠলো। চেকিং-এর জন্য দু'টো আলাদা কাউণ্টার—শ্বেতাঙ্গদের একটা আর কৃষ্ণাঙ্গদের একটা। পৃথিবীর কোনও সভ্য দেশে যে এরকম ব্যবস্থা থাকতে পারে তা কল্পনা করা যায় না। শ্বেতাঙ্গদের কাউণ্টারে যথারীতি হাসিঠাট্টা চলেছে—দারুণ ভীড়। কৃষ্ণাঙ্গদের কাউণ্টারে আমি একা। আমাকে ছেড়ে দেবে এমন কোনও লোকও নেই। প্রায় ঘণ্টা-খানেক ঠায় দাঁড়িয়ে থাকার পর আমার কাছে লোক এলো।

শ্বেতাঙ্গদের সবাইকে ছেড়ে দিয়ে ওই কাউন্টার থেকে সে এসেছে। প্রথমেই সে পাসপোর্ট চাইলো, তারপর তা উলটে পালটে দেখে সে ওটাকে এমনভাবে ছুঁড়লো যে তা গড়িয়ে মাটিতে পড়ে গেল। আমি তা তুলে নিলাম। আমাকে হেঁট হয়ে তুলতে দেখে লোকটা হো হো করে হেসে বললো, "য়্যু ব্লাডি ইণ্ডিয়ানস্, তোমরা নাকি হেঁট হ'তে জানোনা?" আমি জবাব দিলাম, "আমরা মাথা নীচু করতে জানি, মাথা নীচু করে দিতেও জানি।" লোকটা উত্তর শুনে বেশ অবাক হয়ে বললো, "খোকা যে বড্ড কথা জানে! তা, কদ্দিন থাকা হবে?" আমি সব কাগজপত্র গুছিয়ে নিতে নিতে বললাম, "যেদিন তুমি বিছের কামড় খাবে সেদিন।" লোকটা আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে দেখতে দেখতে আমি ও জায়গা ছেড়ে বাইরে পা দিলাম।

হাতে মাত্র একখানা ব্যাগ। কোথায় যাবো কোথায় থাকবো তা কিছুই জানিনা। হোটেলমাত্রই যে আমাকে থাকতে দেবে এমন নয়। চারদিকে কোথাও কালো মানুষের চিহ্নও নেই। এদিকে বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। একবার ভাবলাম, বিমানবন্দরে ফিরে গিয়ে ওখানকার লাউঞ্জে শুয়ে থাকি। কিন্তু তাতেও যে শান্তিতে থাকতে পারবো এমন ভরসা কম। যেদিকে চোখ যায় সেদিকেই এগিয়ে যাওয়া ঠিক করলাম।

একটু এগিয়ে একটা সিগারেটের দোকান দেখে থামলাম। সিগারেট কিনে নেওয়া দরকার। পকেটে হাত ঢুকিয়ে মানিব্যাগ বার করতেই এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটলো। জনা তিনেক শ্বেতাঙ্গ ছোকরা যেন মাটি ফুঁড়ে আমার সামনে হাজির হলো। ওদের

একজনের হাতে একটা ছোরা। সে আমার সামনে এসে বললো "এই নিগার, কাকে বলে এখানে এসেছিস? আয়, কাছে আয়।" কাছে গেলাম, বিনয় সহকারে বললাম, "আমাকে ডাকছেন?" ছেলেটা হেসে বললো, "তোকে নয়তো আমার কালো কুত্তাটাকে। দু'টোই তো সমান।" মাথা ঠিক রাখা কঠিন। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে আমি এগিয়ে গেলাম। অনেকটা ঠাট্টা করেই বললাম, "আপনারা আমাদের মা-বাপ, আপনাদের কুকুর কি আমাদের মতো কালো হ'তে পারে?" কথাটা শুনে ছেলেটা যেন খুব আনন্দ পেলো। সে হো-হো করে হেসে আমার পিঠ চাপড়ে বললো, "কিছু টাকা ছেড়ে এখান থেকে চলে যা।" আমি বললাম, "দয়া করে একটা খবর দেন তো আমি কয়েক শিলিং খরচ করি। আমি কোথায় রাতটা কাটাতে পারি তা যদি একটু বলে দেন।" ছেলেটা মাথা চুলকে বললো, "তোদের নিগারদের থাকবার জায়গা সম্বন্ধে কিছু বলতে পারিনা। কিন্তু একটা কাজ করতে পারিস্। আর দশ মিনিট বাদে এখান দিয়ে কালো বাস যাবে। ওতে করে নিগারদের গ্রামে চলে যেতে পারিস্। এখানেই দাঁড়িয়ে থাক। বাস পেয়ে যাবি। কালো বাস, মনে রাখিস্ কিন্তু। এবার টাকা দে। আমরা যাই।" সুখবর নিঃসন্দেহে। আমি পকেট থেকে একটা এক পাউণ্ডের নোট বার করে দিলাম। ছেলেগুলি তা পেয়েই যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। আমি বাস স্ট্যাণ্ডে দাঁড়ালাম।

মিনিট পাঁচেক বাদেই একটা বিরাট কালোরংয়ের বাস এলো। আমি তাতে উঠলাম। সম্পূর্ণ বাসটাতে কৃষ্ণাঙ্গ ভরতি। এঁরা

শহরে আসে ভোরবেলাতে আর ফিরে যায় সন্ধ্যাবেলায়। শহরের যতো কাজ এদের করতে হয়। রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখা, নর্দমা ঠিক রাখা ইত্যাদি কাজ এদের করতে হয় নামমাত্র মূল্যে। ওভারসিয়াররা চাবুক নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে—সুযোগ পেলেই চাবুকের আঘাতে এদের কালো দেহ থেকে রক্তপাত ঘটায়। বাসে ঢুকে এক নজরে সব দেখে নিলাম। আমাকে দেখে সকলেই যেন ভয় পেয়ে গেছে। আমি আফ্রিকান নই তা ওরা বুঝতে পেরেছে। এশিয়ানদের ওরা বিশ্বাস করেনা। সাহেবদের সাথে হাত মিলিয়ে আফ্রিকানদের নিধন যজ্ঞে এশিয়ানদের অবদান নিতান্ত কম নয়। আমি বুঝলাম যে এদের সাথে ভাব করতে যাওয়ার কোনও অর্থ হয়না।

বাস হু হু করে এগিয়ে চলেছে। কণ্ডাকটর এগিয়ে এসে আমার কাছে পয়সা চাইলো। আমি ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে বললাম, "ভাই, রাতটা কোথায় থাকবো বলে দিতে পারো, আমি কাল সকালেই জোহানেসবার্গ রওনা দেবো।" লোকটা বেশ মিশুক। কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার পর সে আমার ঘরবাড়ির খবর নিয়ে বললো, "তুমি আমার সাথে থাকো। আমি হোটেল দেখিয়ে দেবো।"

ঘণ্টাখানেক চলার পর বাস একটা চেকপোস্টের সামনে থামলো। এটা পেরিয়ে গেলেই শ্বেতাঙ্গ-এলাকা পার হলাম। এবার থেকে মাইলের পর মাইল জুড়ে আফ্রিকানদের বাস। চারদিকে আফ্রিকানদের ভীড়। দেখতেও ভালো লাগে। একটা বাজারে গিয়ে বাস থামলো। সবাই নেমে গেলে কণ্ডাকটর

আমার কাছে এলো। সে বললো, "চলো, তোমাকে নিয়ে যাই। থাকার খুব সুবিধে হবেনা। তবে খাওয়া-দাওয়া ভালোই পাবে।" আমি তার সাথে হাঁটতে লাগলাম। এ গলি ও গলি পেরিয়ে সে একটা বাড়ির কাছে এলো, "এখানেই তোমাকে থাকতে হবে। এটা আমার বাড়ি। হোটেলে কেউ বিশ্বাস করে জায়গা দেবেনা। ইণ্ডিয়ানরা কোনও দিনই আমাদের সাথে ভালো ব্যবহার করেনি। ওরা ব্যবসার খাতিরে আমাদের সাথে মিশেছে বটে, কিন্তু আমাদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদ করেনি।" সে দরজায় ধাক্কা দিতেই তার স্ত্রী বেরিয়ে এলো। নিজেদের ভাষায় তারা কি কথাবার্তা বললো কে জানে, ভদ্রমহিলা আমাকে খুব আদর করে ভেতরে ডেকে নিলো। আমি হাত-মুখ ধুয়ে নিলাম। স্নান করার ইচ্ছেও ছিলো কিন্তু ভদ্রমহিলা বললো যে তাতে ঠাণ্ডা লাগতে পারে।

কনডাকটরের নাম কাফুর। আমি তাকে নাংওয়ানামাশালার ব্যাপার জিজ্ঞাসা করাতেই সে আর তার স্ত্রী দু'জনেই আঁতকে উঠলো। তারপর কাফুর আমার হাত ধ'রে বললো, "তুমি কে? কেন এসেছো?" আমি তখন কাফুরকে সব বললাম। সব শোনার পর কাফুর আর তার স্ত্রী যেন আশ্বস্ত হলো। কাফুর বললো, "শোনো ব্যাণ্ডো, তুমি আমাকে বলেছো তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু এখানে অন্য কাউকে কখনও নাংওয়ানামাশালার নামও বলোনা। এখানকার পুলিশের হাতে খুন হয়ে যাবে। নাংওয়ানামাশালা জোহানেসবার্গের লোক। লেখাপড়া শিখেছে। চমৎকার ছেলে। কিন্তু ওরকম স্বাধীনচেতা ছেলের পক্ষে এদেশে

হাইডেলবার্গ

তখনও দিনের আলো রয়েছে। তাই বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে কাফুরের দেওয়া একটা ঠিকানার দিকে রওনা দিলাম। কাফুরের বিশেষ বন্ধুর ঠিকানা। ভদ্রলোকের নাম মোবুতু। অন্যান্য আফ্রিকানদের থেকে এই ভদ্রলোক স্বতন্ত্র। কারণ এর আঙ্গুরফলের বিরাট ব্যবসা রয়েছে। বাড়ি হাইডেলবার্গে—জোহানেসবার্গ থেকে ট্রেনে যেতে হয়। সেখানেই খামার। হাইডেলবার্গ নামটা জার্মান—জার্মানীর এক বিখ্যাত শহরের নাম। এই নামটা দক্ষিণ আফ্রিকায় বিশেষভাবে চালু রয়েছে—অন্ততঃ দুটো বড়ো শহরের এই একই নাম। একটা জোহানেসবার্গের কাছে—অন্যটা দক্ষিণ কাররুতে—কেপটাউনের পাশে—আফ্রিকার একেবারে নীচে।

ইচ্ছে ছিলো কার্টার ডায়ামণ্ড কোম্পানীর খোঁজ-খবর নিয়ে নিই। কিন্তু তাতে দেরী হয়ে যাবে। হাইডেলবার্গে যাবার জন্য ট্রেন খুব বেশি নেই। বিকেলে একটা আর রাত্রে একটা। রাত্রের ট্রেনে যাওয়া ঠিক নয়। আমি বিকেলবেলার ট্রেন ধরলাম। এরই নাম ছ্যাকরা ট্রেন। ঝিক ঝিক করতে করতে চলেছে। কামরাখানাও অপূর্ব—যাদুঘরে সাজিয়ে রাখবার মতো। চারদিকে এমন কাঠ সাজানো রয়েছে যে দেখলেই মুরগীর খাঁচার কথা মনে করিয়ে দেয়। সাহেবদের জন্য কিন্তু অন্য ব্যবস্থা। তাদের কামরায় সব রকমের সুবিধাই রয়েছে। অবশ্য একথা মনে রাখা দরকার যে আমি দেশবিদেশে ঘুরেছি বলেই আমার কাছে ওখানকার ট্রেনের ব্যবস্থা অদ্ভুত লেগেছে। আমাদের

"দেখি একটা সাদা চামড়ার লোক আমার কলার ধরে ঝাঁকুনি দিচ্ছে।—"

দেশের ট্রেন দেখেও কিন্তু বিদেশীরা একই কথা ভাবে। আমাদের থার্ড ক্লাস কি আর খাঁচার থেকে বেশি কিছু? যাহোক, ওদেশের থার্ড ক্লাস যাদুঘরে রাখবার মতোই। এই খাঁচার মধ্যে প্রায় একশোজন আফ্রিকান। আমি এক কোণায় বসে।

প্রায় আধ ঘণ্টা কেটে গেছে। আমি বোধ হয় ঘুমিয়েই পড়েছিলাম। হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি খেয়ে লাফ দিয়ে উঠলাম। দেখি একটা সাদা চামড়ার লোক আমার কলার ধ'রে ঝাঁকুনি দিচ্ছে। বুঝলাম টিকিট দেখতে চাইছে। ভাষাখানা অপূর্ব—"ব্যাটা কালো কুত্তা, বিনে পয়সায় যাচ্ছিস। কোন দেশের কুকুর তুই?" রাস্তাঘাটে ঝগড়া করবো না ঠিক করাই ছিলো। তাই মুখ কাঁচুমাচু করে বললাম, "ভারতবর্ষ।" লোকটার হাসিতে ট্রেনটা যেন কেঁপে কেঁপে উঠলো, "তাই বল, তাই বল। তোদের দেশে তো লাখে একটা লোক টিকিট কাটে। তা তোর টিকিট আছে? না জোহানেসবার্গের জেলের রুটি-ঝোল খাবার ইচ্ছে হয়েছে?" আমি কোটের পকেট থেকে টিকিট বার করে দিলাম। সেটা সে উলটে পালটে দেখে বললো, "হুঁ, ঠিকই টিকিট কেটেছিস্।" বেশি দূর অবশ্য লোকটাকে যেতে হলো না। মাটিতে যেন একটা ল্যাটা মাছ লুটোপুটি খাচ্ছে—এ দৃশ্য দেখে কে না হেসে পারে? একশো আফ্রিকান হাসির বন্যায় ভেঙ্গে পড়লো। আমিই লোকটার কলার ধরে হিড়হিড় করে টেনে তুলে আমার সামনের বেঞ্চিতে জায়গা করে বসিয়ে বললাম, "বড্ড লাগলো, তাই না?" লোকটা রক্তচক্ষু করে বললো, "কালো কুত্তা, তুই ল্যাং মেরেছিস্। আমার পা বোধহয়

ভেঙ্গেই গেছে। তোর দাঁত না ভাঙ্গি তো আমার নাম মার্টিন ফ্রিলিং নয়।” আমি এবার রুখে দাঁড়ালাম, “কি? ল্যাং মেরেছি? ট্রেনের ঝাঁকুনিতে পড়ে গেলে। আর বলছো ল্যাং মেরেছি? আমি টেনে তুললাম তাই রক্ষে। আমাকে আবার হুমকী দেখানো হচ্ছে?” লোকটা কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলো। তারপর সে জামার কলারে হাত দিয়ে বললো, “কলারটা ছিঁড়েছে। হাইডেলবার্গে তোর আস্ত রাখবো না। এই হাড় ক'খানা নিয়ে কিভাবে দেশে ফিরিস্ তা দেখবো।” লোকটা চলন্ত ট্রেনেই “উঃ বাবা” বলতে বলতে কামরা ছেড়ে চলে গেল।

দু'দিন অনেক রাগ জমা ছিলো। এক ল্যাং মেরেই সে রাগ অনেক কমাতে পেরেছি। ভাবতেও ভাল লাগছিল। কিন্তু চিন্তাও কম নয়। লোকটার বাঁ পা ভাঙ্গেনি, কিন্তু মচকে গেছে নিঃসন্দেহে। হাইডেলবার্গে নামলেই মারধোর শুরু করবে। আমরা প্রায় চলে এসেছি। আর মাত্র মিনিট দশেক বাকি। ভাবলাম, যা হবার হবে। এখন চুপ করে বসে থাকি।

কামরার সব আফ্রিকান আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে। ওরা ভাবতেই পারে না যে এদেশে কেউ সাহেবসুবোকে ল্যাং মেরে ফেলে দিতে পারে। আমি অসম্ভবকে সম্ভব করেছি। দু' একবার মুখ তুলে তাকিয়ে আবার মাথা নামিয়ে নিয়েছি। ওরা যেন আমাকে দেবতা ঠাউরেছে। ওদের ভাষা আমি জানি না। ওরাও গালিগালাজ ছাড়া ইংরাজী জানে না। গালিগালাজ জানে, কারণ ওই ভাষাতেই সব সময় ওদের সাথে সাহেবরা কথা বলে থাকে।

আর মিনিট খানেক বাকি। সকলে সঙ্গের জিনিসপত্র গোছাতে ব্যস্ত। হাইডেলবার্গ ছোট্ট স্টেশন—ট্রেন বেশি সময় দাঁড়ায় না। আমিও উঠে দাঁড়ালাম। হঠাৎ দেখি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা একটা জোয়ান আফ্রিকান আমাকে ডাকছে। পরিষ্কার ইংরাজীতে সে আমাকে কাছে ডাকাতে আমি এগিয়ে গেলাম। সে গড়গড় করে আমাকে বললো, "এক্ষুণি ট্রেন থামবে। ট্র্যাক রিপেয়ার হচ্ছে। এটা বাইরের সিগন্যাল। এখানেই নামতে হবে। স্টেশনে গেলে রক্ষা নেই।" আমাকে আর শিখিয়ে দিতে হলো না। আমি দরজার হ্যাণ্ডেল ধ'রে দাঁড়ালাম। সে ফিরে দাঁড়িয়ে আফ্রিকানদের কি যেন বললো। সঙ্গে সঙ্গে সব ক'জন যাত্রী এক সাথে তারস্বরে একটা গান ধরলো। এদিকে ট্রেনও থেমেছে। ছেলেটা নেমেই বললো, "পেছন দিকে দৌড় লাগাও। এক মিনিটের মধ্যে ট্র্যাক না পেরুলে ধরা পড়ে যাবে। দেখতে পেলেই ওরা গুলী চালাবে।" আমি দৌড় দিলাম। পায়ের শব্দ গানে ঢেকে গেছে। মিনিট খানেক দৌড়নোর পর দেখি, সামনে একটা কাঁচা রাস্তা। ছেলেটা রাস্তার উপরে এসে হাঁটতে লাগলো। ওদিকে ট্রেনটাও ছেড়ে দিয়েছে। গান আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে।

মিনিট পনেরো হাঁটার পর ছেলেটা থামলো। রাস্তার পাশে একটা বড়ো পাথর দেখে সে তাতে বসলো। আমিও বসলাম। ছেলেটার নাম কিভুবা। জোহানেসবার্গে বোর্ডিং-এ থেকে পড়াশুনা করে। আজ বাড়ি ফিরছে। মোবুতুর বাড়ির পাশেই থাকে। সে বললো যে মোবুতুর বাড়িতে যাওয়া এই রাতে

কোনও মতেই ঠিক নয়। মোবুতু প্রভাবশালী লোক—তাছাড়া সাহেবদের সাথে দহরম রয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে সে আমাকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে দ্বিধা করবে না। কিভুবা নিজের বাড়িতে আজ রাতটা রাখবে। আমিও এই যুক্তি মেনে নিলাম। কিভুবার বাড়ি কাছেই। কিন্তু প্রায় ঘণ্টাখানেক লেগে গেল। কোনও গাড়ির আওয়াজ পেলেই কিভুবা আমাকে নিয়ে কোনও গাছের আড়ালে চলে যাচ্ছে। এসব গাড়ির যে কোনওটাই পুলিশের হ'তে পারে। অন্য কোনও দেশে ল্যাং মারাকে অপরাধমূলক কাজ হিসেবে গণ্য করা হয় না। এদেশেও নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে যে কালো চামড়ার মানুষ সাহেবকে ল্যাং মেরেছে সে দক্ষিণ আফ্রিকার অপমান করেছে। ফলে আমার শাস্তি অবধারিত।

কিভুবার বাড়িতেই গেলাম। বাড়ি না বলে কুঁড়েঘর বলাই বাঞ্ছনীয়। খড়ের ছাউনি দেওয়া। মেঝে কিন্তু সিমেণ্টের। তার উপর চাটাই পেতে শুতে হলো। এর আগে খাওয়া জুটেছে একখানা পাঁউরুটি আর কিছু ঝোল। কিভুবার বাবা বুড়ো—চোখে কম দেখেন। আর কোনও আত্মীয়-স্বজন নেই। মামা-বাড়ির তরফ থেকে কিছু টাকা সে পেয়েছিল। তাতেই সংসার চলে। ছেলে হিসাবে কিভুবার তুলনা হয় না। জোহানেসবার্গের যে বিদ্যালয়ে সে পড়ে সেখানেই ঝাড়ুদারের কাজ করে সে থাকা-খাওয়ার খরচ মেটায়। কার্টার কোম্পানীর কথা সে শুনেছে। কিভুবা যে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করতে পারে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছিলাম। হঠাৎ শুনি, কিভুবা ডাকছে। আমি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। সে বললো, "এক্ষুণি তৈয়ারী হয়ে নিন। আর দশ মিনিট বাদে একটা মালগাড়ি জোহানেসবার্গে যাবে। আমি সব ব্যবস্থা করেছি। আপনি ওটাতেই চলে যান। আমিও সঙ্গে যাবো। আপনাকে জায়গামতো পৌঁছে দিয়ে আসবো। আমাকে ভোরবেলাতেই ফিরতে হবে।" আমি কোনও কথা না বলে ওর হাত ধরে রাস্তায় নামলাম। খালি রাস্তা—দৌড়ে সিগন্যালের কাছে এসে দেখি, মালগাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিভুবা আমাকে সোজা ড্রাইভারের কাছে নিয়ে গেল। সাদা চামড়ার লোক—কিন্তু অন্য সবার থেকে এ যেন অনেক পৃথক। আমাকে সে নিজের জায়গায় বসতে দিয়ে বললো, "কিভুবা সব বলেছে। তোমার কোনও ভয় নেই। আমি ঠিক নিয়ে যাবো। মার্টিন পুলিশকে জানিয়েছে। পুলিশও তোমাকে খুঁজছে। তবে এ ব্যাপারে আইন-আদালত হ'তে পারে না। তাই তোমাকে ধরে ঠ্যাঙানোই উদ্দেশ্য। চলে যাচ্ছো ভালই করছো। হাইডেলবার্গ বড় খারাপ জায়গা। নাম শুনেই তো বুঝতে পারছো। কতগুলো গোঁয়ার জার্মান এখানে রয়েছে—ব্যাটারা নাজী বাহিনীর বংশধর। কথায় কথায় ছোরা চালায়। মার্টিন ব্যাটা জাতে ইংরেজ হয়েও ওদের সর্দার। ওর জ্বালায় লোকে অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে।" মালগাড়ি ততক্ষণে যেতে শুরু করেছে। কিভুবা এক কোণায় বসেছিল। এবার সে বললো, "মিস্টার ডাউলিং, সকলেই তোমার মতো মানুষ নয়। তুমি আমাদের যেভাবে সাহায্য করছো তাতে আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই।

এদেশের প্রত্যেক শহরে তোমার মতো দশটা করে লোক থাকলেও আমরা খেয়ে পরে বেঁচে থাকতাম।” ডাউলিং হো-হো করে হেসে উঠে একটা প্যাকেট থেকে কয়েকটা সসেজ বার করে বললো, “খাও। রাত্রে যে কিছু জোটেনি তা মুখ দেখেই বুঝতে পারছি। খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ো। রাস্তায় কোথাও থামবোনা। জোহানেস-বার্গের এক মাইল আগে নামিয়ে দেবো। নেমেই কিমবার্লি-জোহানেসবার্গ হাইওয়ে পাবে। এই রাস্তাটা প্রেটোরিয়া থেকে জোহানেসবার্গ হয়ে কিমবার্লি পর্য্যন্ত গিয়েছে। এই রাস্তা ধরে বকসবুর্গ যাবে। সেখানে বেলা আটটার সময় জোহানেসবার্গের ট্রেন পাবে। তাড়াহুড়ো করবেনা। সাত সকালে কালো মানুষ জোহানেসবার্গে ঢুকতে পারে না। কিভুবাকে আমি মাঝ রাস্তায় নামিয়ে দেবো। ও প্রথম ট্রেনে হাইডেলবার্গে ফিরে যাবে। কাল তোমাকে সাহায্য করেছিল বলে কোনও আফ্রিকান যে ওকে ধরিয়ে দেবে তা নয়, সাবধানের তো আর মার নেই। এমনভাবে কেস্ সাজিয়ে রাখতে হবে যে অন্ততঃ দশজন যেন বলতে পারে যে কাল সারাদিন ও হাইডেলবার্গেই ছিল। এ কাজ আবার আমাকেই করতে হবে।” আমি কোনও কথা বললাম না। কয়লার ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করছিল। আমি জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

ঘড়িতে তখন ঠিক পৌনে চারটা। ডাউলিং গাড়ি থামালো। এখানে আমরা দু'জনেই নামবো। কিভুবা যাবে জোহানেসবার্গ স্টেশনে। আমি যাবো বকসবুর্গে। কাফুরের স্ত্রী-র কথা বারবার মনে পড়ছে। নাংওয়ানামাশালাকে আর দিন পনেরো বাদে ফিরে

ফেলা হবে। হিয়েরেনিমোই বা কোথায় ? যদি তিনি কাছে না থাকেন তো আমাকে চিঠি পাঠাতে গেলেন কেন ? এদেশে হিয়েরেনিমাকে পেলে যে কাজের সুবিধা হতো তাতে সন্দেহ নেই। এ দেশ অন্যায়ের, অবিচারের। এখানে আমি কি করতে পারি ? এদেশের ভাষা জানা থাকলেও হয়তো কিছু করা যেত। পরাজিত হয়ে ফিরে যেতে হবে। জেলে আমাকে বেশিদিন আটকে রাখতে পারবেনা। আন্তর্জাতিক চাপে হয়তো এরা ছেড়ে দেবে। কিন্তু হাত-পা কি আস্ত থাকবে ? দূর ছাই, লণ্ডনে ফিরে যাওয়াই ভাল। কিন্তু তাতে কি শান্তি পাবো ? ছোটবেলায় কেউ চড়াই পাখি ধরলে চুপি চুপি খাঁচার দরজা খুলে পালিয়ে আসতাম। আমার বিজ্ঞান মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বাড়িয়ে তোলার বিজ্ঞান—ধ্বংসের নয়। একটা মানুষকে কয়েকদিন বাদে মেরে ফেলা হবে। এমন কিছু অপরাধ সে করেনি। কাউকে মারেনি—কাউকে খেতে না দিয়ে উপবাসীও রাখেনি। দেশের মানুষের স্বাধীনতা সে চেয়েছে। এটা অপরাধ নয়। আমার পক্ষে তাই শেষ না দেখে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়।

হাঁটতে হাঁটতে বকসবুর্গের কাছাকাছি চলে এসেছি। সকালবেলার সূর্য ঝলমলিয়ে উঠেছে। চারদিকে আলোর বন্যা। আশ্চর্য, এই অন্ধকার আর পরাধীনতার দেশেও সূর্য ওঠে !

ডাউলিং নিঃসন্দেহে বুদ্ধিমান লোক। বকসবুর্গের কাছাকাছি কোথাও চেকপোস্ট নেই। বাধা ছাড়াই আমি শহরে ঢুকে গেলাম। শহর না বলে শহরতলী বলাই ভাল। বিরাট শহর জার্মিস্টনকে ডানদিকে অনেক আগেই ফেলে এসেছি। ওখান থেকে

জোহানেসবার্গে যেতে পারতাম। কিন্তু তাতে অসুবিধাও ছিল। চেক পোস্ট পেরিয়ে শহরে ঢুকতে পারতামনা—পাশ কোথায় পাবো? মনে মনে ডাউলিংকে ধন্যবাদ জানালাম।

বকসবুর্গ থেকে ঠিক আটটায় ট্রেন ছাড়লো। আবার মুরগীর খাঁচায় বসতে হলো। এবার কিন্তু কোনও চেকিংয়ের বালাই নেই। প্রায় হাজারখানেক আফ্রিকান শ্রমিকের সাথে আমি বেড়া পেরিয়ে শহরে ঢুকে পড়লাম। ঘটনার কি অপূর্ব প্রবাহ! কাল জোহানেসবার্গ পৌঁছেছিলাম—তখন টাই কোট প্যাণ্ট পরা নিখুঁত বিদেশী। আর আজ? টাই খুলে ব্যাগে রেখেছি। কোট-প্যাণ্টে ধুলোবালি ভরা। ইংরাজীতে এই চেহারার লোক-দেরই ট্র্যামপ্ বলা হয়।

স্টেশনের আশে পাশে অনেক আফ্রিকান ঘোরাফেরা করছে। এরা রেলওয়ের লোক। আমি বেশ ভারিক্কী দেখে একজনকে ধ'রে বললাম, "এখানে টেলিফোন আছে?" লোকটা মিনিট কয়েক ধ'রে আমাকে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে দেখলো। তারপর সে একটা লাইটপোষ্টের আড়ালে টেনে নিয়ে বললো, "এদেশের কোনও কালো মানুষ টেলিফোন করেনা। তুমি কোথাকার উজবুক?" আমি বললাম, "দেখো, আমি ভারতবর্ষ থেকে আসছি। কার্টার ডায়ামণ্ড কোম্পানীতে যাবো।" লোকটা এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললো, "এই রাস্তা ধ'রে মাইলখানেক চলে যাও। কোথাও থামবেনা, কোনও কথার জবাব দেবেনা। মাইলখানেক যাবার পর একটা বিরাট মাঠ পাবে। তাতে ছেলেরা ক্রিকেট খেলছে। সেই মাঠ পেরিয়েই যে বাড়িটা তাতে কার্টার ডায়ামণ্ড কোম্পানী।

মনে রেখো, কোথাও দাঁড়াবেনা, কোনও দিকে তাকাবেনা। সোজা যাবে। যদি কেউ পথ আগলে দাঁড়ায় তো বলবে যে তুমি মোজাম্বিক থেকে আসছো। কার্টার ডায়মণ্ড কোম্পানীতে চাকরীর খোঁজে যাচ্ছো। আরেকটা কথা। এখানকার ভারতীয়দের এড়িয়ে চলো। সবাই খারাপ এমন নয়—কিন্তু ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় করে তো লাভ নেই। তাতে ঘোলা জল আরও ঘোলা হবে।" আমি "ধন্যবাদ" বলে এগিয়ে চললাম।

দু' পা এগুতে না এগুতেই হাসিঠাট্টার আওয়াজ কাণে এলো। বাচ্চা বাচ্চা সাহেবের ছেলেরা পর্য্যন্ত হাসিঠাট্টায় মত্ত—আমি যেন চিড়িয়াখানার জন্তু। মাথা হেঁট করে হনহনিয়ে এগিয়ে চললাম। মাইল খানেক যেতে মিনিট পনেরো লাগলো।

মিস্টার ডেভিস

খেলার মাঠ পেরিয়েই এক বিরাট বাড়ি। চারতলা। সমস্ত বাড়িটা ঝকঝক তকতক করছে। আমি ওপর দিকে তাকিয়ে তিনতলায় কার্টার ডায়মণ্ড কোম্পানীর নাম দেখতে পেলাম। গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছি। দারোয়ান বাধা দিল। আমি বললাম, "মোজাম্বিক থেকে এসেছি। মিস্টার ডেভিসের সাথে দেখা করবো। আমার দেশ ভারতবর্ষ, একটু খবর পাঠাও।" দারোয়ান কি ভাবলো কে জানে—পাশেই রাখা টেলিফোনে কথা বলতে লাগলো। তারপর হঠাৎ আমার হাতে টেলিফোন দিয়ে বললো, "কথা বলো"। "আমি রিসিভার কানে লাগাতেই ভারী

গলায় শুনতে পেলাম, "তোমার নাম কি?" নাম বললাম। উত্তর পেলাম, "না, হলোনা। অন্য নাম আছে?" আমি বললাম, "হ্যাঁ, আছে, কালোমানিক।" ওপর থেকে যে হাসি টেলিফোনের তারে ভেসে এলো তাতে রিসিভার প্রায় ভেঙ্গে যায়। মিনিট দুয়েক হাসি চললো। তারপর শুনতে পেলাম, "কাম আপ।" আমি দারোয়ানকে একথা বলতে সে মুচকি হেসে রাস্তা ছেড়ে দিল।

আমার জন্য লিফট্ নয় তা আমি জানতাম। তাই সোজা সিঁড়ি দিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। মনে আছে, ছোটবেলায় একবার কলকাতায় এক অফিসে গিয়েছিলাম। জামাকাপড় পরিষ্কার ছিলনা। হিন্দুস্থানী লিফটম্যান সোজা ভাগিয়ে দিয়ে বলেছিলো যে অফিসারদের জন্য লিফটে চড়তে এসে অপরাধ করেছি। আমি হেসে উঠলাম। পাশ দিয়ে যেতে থাকা দু' চারজন নিগ্রো অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো।

সিঁড়ির ঠিক ডানদিকেই কার্টার ডায়ামণ্ড কোম্পানী। দরজা ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। আমি আসছি এই খবরটা বোধহয় মিস্টার ডেভিস সবাইকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় তাই প্রথমবারের মতো সাহেবদের কাছ থেকে সম্মান পেলাম। খুব চটপটে একটা ছেলে এসে করমর্দন করে বললো, "মিস্টার ব্যাণ্ডো?" আমি মাথা নাড়তেই সে বললো, "আমি মিস্টার ডেভিসের পি. এ.। আমার নাম ডোনাল্ড। আপনি আসুন।" আমি ছেলেটার পিছু নিলাম। দরজার বাইরে ডেভিসের নাম লেখা। ভেতরে ঢুকলাম।

চেয়ার ছেড়ে যিনি উঠে এলেন তিনি ঘটোৎকচের ছোট ভাই বললে অন্যায় হয় না। বিশাল দেহ। তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে একটা চেয়ারে বসালেন। টেবিলে চা-খাবার সাজানো। পাশেই বাথরুম। আমি হাত-মুখ ধুয়ে পুরো খাবার না খাওয়া পর্যন্ত ডেভিস কোনও কথা বলতে বা শুনতে রাজী হলেন না। এ ব্যাপারে না-না করার কোনও ইচ্ছেও আমার ছিলো না—এত পথ হেঁটে এসে খিদেও পেয়েছিল।

খাওয়া শেষ হ'লে ডেভিসকে আমি সব কথা বললাম। তারপর আমি হিয়েরেনিমোর সাথে তার সম্পর্ক জানতে চাইলাম। নাংওয়ানামাশালার ব্যাপারে হিয়েরেনিমোই বা উৎসাহী কেন তাও জানা দরকার।

প্রশ্নগুলি শুনে ডেভিস কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর তিনি বললেন, "এ প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার আগে তোমাকে সব কথা খুলে বলা দরকার। আমার বাড়িতে ব'সে সব বলতে পারলেই ভাল হতো। কিন্তু তা হবার নয়। কালো মানুষকে নিয়ে টেবিলে বসে খাচ্ছি দেখলে এখানকার মানুষ আমাকে পাততাড়ি গুটোতে বাধ্য করবে।

আজ থেকে বছর কুড়ি আগেকার কথা। আমি আমার বাবার সাথে স্পেনে বেড়াতে গেছি। গ্রাণাডায় হিয়েরেনিমোর সাথে আলাপ হলো, চমৎকার লোক। আমার বাবা তখন দক্ষিণ আফ্রিকায় সবে বাসা করেছেন। হিয়েরেনিমোর সাথে কথা বলে বাবা বুঝলেন যে খাঁটি লোকের সাথেই আলাপ হয়েছে। হিয়েরেনিমো বললেন যে বাবা যেখানে হীরের লোভে মাটি

খুঁড়ছেন সেখানে কিছুই পাওয়া যাবে না। তবে কিমবার্লির উত্তরে জোহানেসবার্গের পশ্চিমে ভ্রাইবুর্গের কাছে হয়তো কিছু পাওয়া যেতে পারে। হিয়েরেনিমো বৈজ্ঞানিক। কিন্তু তিনি যে এসব ব্যাপারেও এতো চুলচেরা বিচার করেছেন তা ভেবে আমরা অবাক হয়ে গেলাম। আমি বাবাকে বললাম, "যে করে হোক্ ভদ্রলোককে নিয়ে চলো।" হিয়েরেনিমো প্রথমে রাজী হননি। তিনি বৈজ্ঞানিক। ধনরত্নের খোঁজে তাঁর কোনও আগ্রহ নেই। বাবা হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। আমি কিন্তু চুপ করে রইলাম না। হিয়েরেনিমোকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চললাম। অবশেষে অনেকটা বিরক্ত হয়ে ভদ্রলোক বইয়ের তাক থেকে একটা পাণ্ডুলিপি বার করে আনলেন। পাতাগুলো খুলে খুলে পড়েছে ; প্রাচীন পর্তুগীজ ভাষায় লেখা। হিয়েরেনিমো বললেন যে এটা নাকি একজন পর্তুগীজ নাবিকের লেখা। লোকটা ভাস্কো-ডা-গামার সাথে আফ্রিকায় এসেছিলো। তখন ১৪৯৮ সন। মোম্বাসা থেকে সে জাহাজ ছেড়ে পালিয়ে যায়। ভাস্কো ডা গামার অত্যাচারই পালানোর কারণ। পর্তুগীজরা যখন মোম্বাসা আক্রমণ করে ও হত্যালীলা চালিয়ে যায় তখন লোকটা প্রতিবাদ জানিয়েছিল। ওকে যখন সবাই মিলে মেরে ফেলবার সিদ্ধান্ত নেয় তখন সে কোনও মতে তা জানতে পেরে রাতের অন্ধকারে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। টাঙ্গানাইকা পেরিয়ে রোডেশিয়ায় ঢোকার পর সে জংলীদের হাতে ধরা পড়ে। লোকটার গুণ ছিল অনেক —সে ডাক্তারী বিদ্যা জানতো। যে করেই হোক না কেন সে মুক্তি পায় ও কিমবার্লিতে হাজির হয়। এসব নামগুলো কিন্তু

তখন ছিল না। যা হোক, আজকের ভ্রাইবুর্গ-এর কাছে সে আস্তানা গড়ে তোলে। ঢাক মারফৎ চারদিকে খবর চলে যাবার জন্যই বোধহয় লোকটির কোনও বিপদ হয়নি। এমনকি সে একটি স্থানীয় মেয়েকে বিয়ে করে ঘর সংসারও করতে থাকে। আফ্রিকার বনে বনে ঘুরে সে হীরে-জহরৎ কম জমায়নি। সেগুলি সে একটা ঝরণার ধারে পুঁতে রেখে যায়। পাণ্ডুলিপিটা বংশক্রমে রয়ে যায়। এটাকে সকলেই দেবতার মতো পূজা করেছে। শ্বেতাঙ্গ অত্যাচার শুরু হবার পর থেকে এটা আর ওরা হাতছাড়া করেনি—পড়ানোর চেষ্টাও করেনি। ভাস্কো ডা গামার অত্যাচার নিয়ে পড়াশুনা করতে গিয়ে হিয়েরেনিমো এই পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেন। সেই পর্তুগীজের কোনও বংশধর আজ বেঁচে নেই। তাই সোনাদানার উপর কারুরই দাবী নেই। হিয়েরেনিমো বললেন যে তিনি সব সোনাদানা আমাদের পাইয়ে দেবেন যদি আমরা লাভের শতকরা পঁচিশ ভাগ অত্যাচারিতদের জন্য ব্যয় করি। আমরা সেই অঙ্গীকার করলাম। যা ধনরত্ন পাওয়া গেল তাতে দশ পুরুষ বসে খাওয়া যায়। আজ দশ বছর হলো বাবা মারা গেছেন। আমরা ব্যবসা বাড়িয়ে চলেছি। আমাদের আয়ের পঁচিশ ভাগ আমরা আফ্রিকানদের জন্য ব্যয় করছি। আমাদের টাকায় এখানকার ছেলেরা লেখাপড়া শিখছে—বিদেশ যাচ্ছে। আমাদের টাকাতেই নাংওয়ানামাশালা ইংল্যাণ্ডে লেখা-পড়া শিখেছে। হিয়েরেনিমোর সাথে আমাদের চুক্তি হয়েছিলো যে প্রতিটি ছেলেকে ভদ্রলোকের অনুমতি নিয়ে বিদেশে পাঠানো যাবে। এটা অবশ্য চুক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। গত বিশ বছরে

আমাদের মতপার্থক্য হয়নি। আমরা যাকে মনোনীত করি হিয়েরেনিমো তাকেই মেনে নেন। পেরুতে বসবাস করলেও হিয়েরেনিমো দু'তিন বছর বাদে বাদেই এদেশে আসেন।

নাংওয়ানামাশালা যে কোনও আফ্রিকানের থেকে অনেক বেশি বুদ্ধিমান। লণ্ডনের স্কুল অব ইকনমিকস-এ অতো ভালো ছেলে ছিলোনা। হিয়েরেনিমোর সাথে ওর ব্যক্তিগত আলাপ ছিলো। হিয়েরেনিমো প্রায়ই বলতেন যে এই ছেলেটি মানুষের মুক্তির পথ দেখিয়ে দেবে। নাংওয়ানামাশালা সে আশা পূর্ণ করতে পারেনি। এদেশে তার কোনও পথ নেই। এরোপ্লেন ছিনতাই করে হয়তো লাভ হ'তো যদি ওরা বুদ্ধি করে কঙ্গো বা এঙ্গোলায় চলে যেতো। তা ওরা করেনি।

নাংওয়ানামাশালার শাস্তির খবর শুনে হিঁয়েরেনিমো বিশেষ বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন। মাসত্বয়েক আগে হঠাৎ তিনি একদিন এসে হাজির। যে করে হোক নাংওয়ানামাশালাকে ছাড়িয়ে আনতে হবে। আমি বললাম, তা অসম্ভব। এ ব্যাপারে মাথা ঘামাতে গেলে ব্যবসা গুটোতে হবে। হিয়েরেনিমো রেগে যাচ্ছেতাই বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। বিকেল বেলায় চিঠি পেলাম, তিনি আমাদের সাথে সব সম্পর্ক ছেদ করছেন। সঙ্গে সঙ্গে আমি তাঁর হোটেলে গেলাম। অনেক কথাবার্তা হ'লো। হিয়েরেনিমো আমাকে নিজের ছেলের মতো ভালবাসেন। কিন্তু অত্যাচারিত মানুষকে তিনি বোধহয় নিজের থেকেও বেশি আপন ভাবেন। তিনি আমাকে বললেন যে আমরা যেন কোনওমতে নাংওয়ানামাশালার সাথে যোগাযোগ

করি। তিনি নিজে ইংল্যাণ্ডে যাচ্ছেন—পার্লামেণ্ট থেকে যদি কিছু করা যায়।

দিন সাতেক আগে হিয়েরেনিমো ফিরে এলেন। পাগলের মতো চেহারা, চুলগুলো এলোমেলো—মুখটা যেন ঝুলে পড়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কি হলো হিয়েরেনিমো?" তিনি বললেন, "ওদিকে কোনও সুবিধা হলোনা। ওখানকার উদরাপন্থীরাই এবারে কাঠখোট্টা; অন্যদের তো কোনও কথাই নাই। এখন একমাত্র উপায় ব্যাঙো।" আমি বললাম, "ব্যাঙো কে?" হিয়েরেনিমো বললেন, "ব্যাঙো এক স্বাধীনচেতা যুবক।" তিনি আমাকে পেরুর কাহিনী খুলে বললেন। তারপর আমরা দু'জনে মিলে ডোনাল্ডকে দিয়ে চিঠিটা লেখালাম। তখন তুমি সমুদ্রে। হিয়েরেনিমো জানতেন যে তুমি এই চিঠি অবহেলা করবেনা। তাই তিনি হীথরোতেও চিঠি ঠিক করে রেখেছিলেন। নিজে থাকতে পারেননি কারণ পেরুতে তাঁর বিশেষ কাজ রয়েছে। তিনি দু'একদিনের মধ্যেই ফিরে আসবেন—তাতে সন্দেহ নেই।

এ তো গেল ওদিককার ব্যাপার। এদিকে নাংওয়ানামাশালার কি হয়েছে শোন। তাকে মাফেকিং-এ জেলে আটকে রাখা হয়েছে। আজ থেকে ঠিক সাতদিন বাদে গুলী করে মারা হবে। আমি হাল ছেড়ে দিয়েছি। তুমি যদি কিছু করতে পারো তো করো।"

ডেভিসের কথার সুরে আগ্রহের অভাবটাই বেশি ছিলো। বুঝলাম যে ভদ্রলোক, মোটেই আফ্রিকান-দরদী নন।

নন হিয়েরেনিমোর চাপে পড়ে কালো মানুষদের জন্য পয়সা খরচ করেন মাত্র। নাংওয়ানামাশালার ব্যাপারে এর কাছ থেকে কোনও সাহায্য আশা করা বৃথা। আমি উঠে দাঁড়ালাম। ডেভিস দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বললেন, "তোমার যখন খুশী এখানে আসবে ব্যাণ্ডো। আমি পয়সা-কড়ি দিয়ে সাহায্য করতে পারবো।" আমি ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এলাম।

অনেক বেলা হয়েছে। ডেভিসের দয়ায় খিদে নেই। কিন্তু ঘুম পেয়েছে। শহরের মধ্যে একমাত্র পার্কেই ঘুমোনো যায়। হোটেল তো আর কালো মানুষদের জন্য নয়। আর রয়েছে সিনেমাহল। সেখানে কালো মানুষদের জন্য আলাদা জায়গা। আমি সবচেয়ে কাছের সিনেমাহলে ঢুকে দুপুরবেলা কাটিয়ে দিলাম। ঘুমটাও নিতান্ত মন্দ হ'লো না। সিনেমা যখন শেষ হলো তখন শরীরের সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে। সেখান থেকে সরাসরি স্টেশনে এলাম। মাফেকিং-এ যেতে হলে সকালের ট্রেনই ভালো। রাতের গাড়ি শ্রমিকদের নিয়ে যাবে। তাতে নানা অশান্তি। আমি রাতটা আফ্রিকানদের ওয়েটিং রুমেই কাটিয়ে দিলাম।

মাফেকিং

ট্রেনটা যখন মাফেকিং-এ ঢুকলো তখন সকলের দেখাদেখি আমিও এক টুকরো কাপড় দিয়ে নাক-মুখ ঢেকেছি। অসহ্য গরম। ধূলো উড়ছে বলা বোধহয় ঠিক নয়, বালি উড়ছে বলাই সঙ্গত। কাছেই বৎসোয়ানা—কালাহারি মরুভূমির দেশ।

ট্রেনে বসেই ভবিষ্যতের কাজ ঠিক করে রেখেছিলাম। আর বেশিদিন হাতে নেই। আজই যাহোক করতে হবে। এ জায়গায় সাদা-কালোর কড়াকড়ি অনেক শিথিল। ফলে, চায়ের দোকানে পা ছড়িয়ে বসে পেট ভরে খেয়ে নিতে অসুবিধা হলো না। সেখানকার কাফ্রি মালিকের কাছ থেকে অনেক কায়দা করে বেশ কয়েকটা দরকারী খবর বার করে নিলাম। মাফেকিং-এ একটাই মাত্র জেল। কিন্তু তা বেশ বড়ো। জেলের উত্তর-পশ্চিমের প্রায় সবটা জুড়েই মরুভূমি। পূব আর দক্ষিণে পালানোর কোনও পথ নেই। এদেশের পুলিশ ঠিক অবহেলা করার মতো নয়।

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর বুঝতে পারলাম যে স্বজাতির মুক্তির জন্য এই কাফ্রির মাথাব্যথার অভাব নেই। একটা বিরাট দলের সে নেতা। এই দল শ্বেতাঙ্গ চোর-ডাকাত-খুনীর হাত থেকে আফ্রিকানদের বাঁচিয়ে থাকে। আমি অনেক ভেবে ওকে সব কথা বলা ঠিক করলাম। রেস্তোরাঁর পেছনদিকে একটা চোরাঘরে বসে কথা হলো। আমি ওর কাছে সাহায্য চাইলাম। আমি ওকে বললাম যে আমি আজ বিকেলেই মাফেকিং-এর জেলে ঢুকবো। আমার ঠিক পেছনে যেন দু'একজন শিক্ষিত আফ্রিকান থাকে। ওরা কোনও মতেই আমার সাথে সম্পর্ক রাখবে না—

কেবল আমি যা করি তা দেখবে ও সন্ধ্যার মধ্যেই এদেশের সব বড়ো বড়ো কাগজে রিপোর্ট পাঠানোর ব্যবস্থা করবে। আগামী-কাল সকালেই দেশের সব বড়ো কাগজে অবশ্যই রিপোর্ট পাঠানো চাই। যেসব কাগজ ইংল্যাণ্ডে যায় সেগুলি যেন কোনও মতেই বাদ না যায়। আফ্রিকান রেস্তোরাঁ মালিক তক্ষুণি ছু'জন লোককে ডেকে আনালো। এরাই আমার পেছনে থাকবে। আমি ওদের সব বুঝিয়ে দিলাম। তারপর রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এলাম।

একটা পার্কে ঢুকে কিছু সময় ঘুমিয়ে নেবার পর যখন উঠলাম তখন ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে। যে কোনও মরু অঞ্চলেই এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। পেরুতে এরকম আবহাওয়ার সাথে পরিচিত হয়েছি—তাই বিশেষ অবাক না হয়ে পার্কের মধ্যে বসেই টাই পরলাম—চুল ঠিক করে আঁচড়ে নিলাম। তারপর ঠিক শহরের মাঝখানে গেলাম। লোক ছু'টো তখন পেছনে রয়েছে। আমি ফিরে তাকাতেই তারা হাত নেড়ে এগিয়ে যেতে বললো।

গুণ্ডাইকের সাথে হাতাহাতি

আমি সোজা সবচেয়ে ধনীপাড়ায় গিয়ে হাজির হলাম। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই এপাড়ায় আফ্রিকান কেউ থাকবে না। তখন সঙ্গের লোকদুটোকে চলে যেতেই হবে—আমার উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হবে না। যা করার এখনই করতে হবে।

এদেশে জেলে যাবার সোজা রাস্তা রেস্তোরাঁয় ঢুকে হাঙ্গামা করা। রেস্তোরাঁয় ঢোকাই বারণ। তারপর তো হাঙ্গামা!

বেশিদূর যাবার দরকার হ'লো না। সামনেই জমকালো রেস্তোরাঁ। পিয়ানোর টুংটাং আওয়াজ আসছে। সন্ধ্যাবেলার পোষাক পরে সাহেব-মেমসাহেবরা ঢুকছে—বেরুচ্ছে। চারদিকে অফুরন্ত আনন্দের আমেজ। আমি সোজা ঢুকতে গেলাম। দারোয়ানটা প্রথমে অবাকই হয়ে গেছিলো। মিনিটখানেক হাঁ করে তাকিয়ে থেকে সে আমাকে গলাধাক্কা দিলো। আমি ওকে "হাঁ হাঁ কি করো কি করো" বলতে বলতেই জুজুৎসুর এক প্যাঁচ লাগালাম। লোকটা ঘুরতে ঘুরতে দড়াম করে দরজায় গিয়ে আছড়ে পড়লো। সে শব্দে দোকানের মালিক বেরিয়ে আসতেই আমি তার মুখে এক প্রচণ্ড ঘুষি লাগালাম। ইতিমধ্যে রাস্তায় শ'খানেক আফ্রিকান আর শ্বেতাঙ্গ জমায়েৎ হয়েছে। কে যে প্রশংসা করছে আর কে নিন্দা করছে তা বোঝা ভার। চারদিকে চেঁচামেচি আর হৈ-হুল্লোড়। আমি আরও দু'তিনটে লোককে মাটিতে ফেলে দিয়ে দৌড় লাগালাম। ভাগ্যিস সন্ধ্যা হয়েছিলো, তাই রক্ষে। নয়তো পেছন থেকে ছোঁড়া রিভলবারের গুলীতে প্রাণই হয়তো হারাতে হ'তো। দৌড়ে আমি একটা পার্কের মধ্যে ঢুকে "পুলিশ পুলিশ" বলে চেঁচাতে লাগলাম। পুলিশ কাছেই ছিলো। না চেঁচালে হয়তো গুলীই করতো। পাঁচটা লোককে ধরাশায়ী করে আমি পুলিশকে কেন ডাকছি তা বোধহয় ওরা বুঝে উঠতে পারেনি। যাহোক, মিনিট দশেকের মধ্যেই আমি ধরা পড়লাম।

একটা জীপে করে আমাকে পুলিশের বড়ো আস্তানায় নিয়ে যাওয়া হলো। আমার শাস্তির দাবীদার পাঁচজন আগেই হাজির হয়েছে। রেস্তোরাঁর মালিকের নাক পাকা মূলোর মতো ফুলে

উঠেছে। দারোয়ানকে দেখে মনে হয় যেন বহু বছরের গোদের রোগী—ডান পা'টা বিশেষভাবে জখম হয়েছে। আমাকে দেখেই সে জার্মান ভাষায় গালিগালাজ করে উঠলো। অন্য তিনজন নাকি এ শহরের নামকরা লোক। এদের মধ্যে মোটাসোটা গোলগাল লোকটি আবার এদেশের বিখ্যাত নেতা। নাম থর্ণডাইক।

আমাকে পুলিশ অফিসারের ঘরে নিয়ে যাওয়া হ'লো। সে প্রথমেই কোনও কথা না বলে একটা চাবুক বার করলো। বার তিনেক আমাকে মারার পরও আমি কাঁদছিনা বা পা ধরছিনা দেখে সে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, "তুই কে? তোকে দেখে তো আফ্রিকান মনে হচ্ছেনা।" আমি পকেট থেকে পাসপোর্ট বার করে দিলাম। অনেকক্ষণ ধরে সে তা উলটে-পালটে দেখলো। তারপর কোনও ভনিতা না করেই বললো, "তুই ইণ্ডিয়ান কুত্তা! এ দেশে এসেছিস্ কেন?" এ প্রশ্নের জবাব অনেক আগেই তৈয়ারী করা ছিলো। হিয়েরেনিমোকে যে ঠকাতে পারে সে লোক কোনও মতেই আমার বন্ধু নয়। ডেভিসকে একটু যন্ত্রণা দেবার এই চমৎকার সুযোগ কি কখনও হারাণো যায়? আমি পকেট থেকে হিয়েরেনিমোর নাম-ঠিকানাহীন চিঠিটা বার করে দিয়ে বললাম —"জোহানেসবার্গের ডেভিস সাহেব আমাকে এনেছে।" অফিসার আরও অবাক হলো। সে কাকে জানি টেলিফোন করে এ ব্যাপারে খবর নেবার জন্য বললো। তারপর আমার দিকে ঘুরে সে জানালো, "তিন বছরের জন্য তোর জেল হ'লো। আজ রাতে এখানেই থাকবি। কাল ভোরে তোকে জেলে নিয়ে যাবে।" আমি সবিনয়ে বললাম, "স্যার, আমার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ

জানতে পারি ? রেস্তোরাঁতে কি ইণ্ডিয়ানদের ঢোকাও বারণ ?” লোকটা রাক্ষুসে হাসি হেসে বললো, “অভিযোগ ? থর্নডাইক সাহেবের ডান হাত মচকে গেছে। তুই রাস্তায় বেরুলে এখানকার মানুষ ডালকুত্তা দিয়ে তোকে ছিঁড়ে খাওয়াবে। তিন বছর এদেশের হাওয়া খেয়ে থাক্। তারপর তোকে নিয়ে কি করবো তা ভেবে দেখা যাবে।” আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “আমাকে কোনও বিচারকের কাছে নিয়ে যাবেননা ?” অফিসার জবাব দিলো, “থর্নডাইক এখানকার বিচারক। তাঁর বিচারেই তোর তিন বছরের জেল।” আমি আর কথা বাড়ালামনা। যা চেয়েছিলাম তা ভালোভাবেই শেষ হয়েছে। এবার আসল কাজ।

রাত্রিতেই পাহারাদারকে হাত করে রেখেছিলাম। আমার মানিব্যাগ থেকে তিনখানা নোট কেবল হাত বদল করতে হয়েছিলো। কেন জানিনা, আমার ব্যাগ, মানিব্যাগ, কোট ইত্যাদি কেড়ে নেওয়া হয়নি। যাহোক, পরদিন ভোরবেলাতেই “জোহানেসবার্গ নিউজ” হাতে এলো। প্রথম পৃষ্ঠাতেই খবর ছাপানো হয়েছে ঃ—

“ইণ্ডিয়ান বৈজ্ঞানিকের ঔদ্ধত্য”

গতকাল সন্ধ্যাবেলায় মাফেকিং-এ এক ইণ্ডিয়ান গুণ্ডা পাঁচজন শ্বেতাঙ্গকে ধরাশায়ী করেছে। আহতদের মধ্যে একজন হলেন এদেশের সর্বজনশ্রদ্ধেয় মিস্টার থর্নডাইক। তিনি কৃষ্ণাঙ্গদের উন্নতির জন্য দু'টো বাসের দাবী জানিয়েছিলেন, মাফেকিংয়ের পাশে মরুভূমি এলাকায় শহরে বস্তীগুলি সরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। এই লোকটির হাত ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। আর

যারা আহত হয়েছেন তাঁরা হলেন চলচ্চিত্র নায়ক এণ্টনিও দ্য সারময়, কর্পোরেশনের কাউন্সিলার ইয়ান ডার ভক্, "দ্য ইভনিং গ্যাদারিং" রেস্তোরাঁর মালিক ফিলিপ মারকস ও দারোয়ান জোসেফ নিকোল। এদের মধ্যে শেষ দু'জনের আঘাত বেশি।

মিস্টার থর্নডাইক নিজেই বিচার করে ইণ্ডিয়ানটাকে তিন বছরের জন্য মাফেকিং জেলে আটক রেখেছেন। তিন বছর বাদে বিচার করে ভবিষ্যৎ ঠিক করা হবে। পাশপোর্ট থেকে জানা যায় যে ইণ্ডিয়ানটি বাঙ্গালী। নাম রনদা বন্দ্যোপাধ্যায়, ওরফে ব্যাণ্ডো। বলা দরকার যে বাঙ্গালীদের প্রায় সকলেই টেররিষ্ট—কামান-বন্দুক নিয়ে এরা লড়াই করে থাকে।

আমরা এই ব্যাপারে পুরো অনুসন্ধান দাবী করছি। এই ইণ্ডিয়ান কি ক্ষেপে গিয়ে এত কাণ্ড করেছে? এমনও হ'তে পারে যে থর্নডাইককে হত্যা করবার জন্যই তাকে বিদেশ থেকে ভাড়া করে আনা হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকাতেই যদি এরকম ব্যাপার হ'তে থাকে তো আমরা কোথায় যাবো? নিজেদের দেশ ত্যাগ করে যে সব জার্মান, ইতালীয়ান, রাশ্যান, পর্টুগীজ, ডাচ, ফরাসী, ইংরেজ ও আমেরিকান সাদা চামড়ার মাহাত্ম্য বজায় রাখবার জন্য এদেশে এসেছেন তারাই এ প্রশ্নের জবাব দিন।

এই খবরের পাশেই থর্নডাইক সাহেবের ছবিসহ এক বিরাট লেখা প্রকাশিত হয়েছে। হেডিং দেওয়া হয়েছে—"থর্নডাইককে হত্যার জন্য ইণ্ডিয়ান টেররিষ্টের অপচেষ্টা।" যা লেখা হয়েছে তার সারমর্ম হ'লো, "পৃথিবীর সর্বত্র কালো চামড়ার মানুষের ঔদ্ধত্য বাড়ছে। আমেরিকায় এরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকত্ব পেয়ে

করছেনা, এশিয়ায় এদের আধিপত্য ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করছে। আফ্রিকার সর্বত্র কালোমুক্তির শ্লোগান তুলে এরা ইউরোপীয় সভ্যতার মূলে কুঠারাঘাত করছে। এতদিন অস্ট্রেলিয়া, আর্জেনটিনা, রোডেশিয়া আর দক্ষিণ আফ্রিকাতে কালো ঔদ্ধত্য মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু গতকাল মাফেকিং-এ যা ঘটেছে তা নিঃসন্দেহে চিন্তার কারণ।

ভারতীয়রা বহু-বছর ধরে ইংরেজ হত্যা করেছে, তথাকথিত স্বাধীনতার জন্য টেররিজমের পথ নিয়েছে। বাঙ্গালীরা টেররিজমের ভক্ত। ওদেরই একজন সুভাষ বোস জার্মানী আর জাপানের সাথে হাত মিলিয়ে ইউরোপ ও আমেরিকার সভ্যতা ধ্বংস করবার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল।

কিন্তু আমরা একথা ভেবে অবাক হচ্ছি যে দক্ষিণ আফ্রিকার বুকে একজন ভারতীয় গুণ্ডামি করবার সাহস কোথা থেকে পেল? দক্ষিণ আফ্রিকায় আইন-শৃংখলা ব'লে কি কিছু থাকবেনা? এখানকার গণ্যমাণ্য ব্যক্তিরা কি রেস্তোরাঁয়-বারে সভ্যভাবে খাওয়া-দাওয়া করতেও পারবেনা?

ভারতীয় গুণ্ডাটা পুলিশকে জানিয়েছে যে সে জোহানেসবার্গের বিখ্যাত ব্যবসায়ী মিস্টার এলান ডেভিসের আমন্ত্রণে এদেশে এসেছে। আমাদের প্রতিনিধি কাল রাতেই মিস্টার ডেভিসের সাথে কথা বলেছে। মিস্টার ডেভিস এই গুণ্ডাকে চেনেন না জানিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন যে গতকাল এই গুণ্ডাটা তাঁর অফিসে চাকরীর খোঁজে গিয়েছিলো। তিনি ওকে ঘাড় ধ'রে বার করে দিয়েছিলেন। এর বেশি কিছু তিনি জানেননা। আমরা

মিস্টার ডেভিস্‌কে বিশ্বাস করি। তিনি দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বলেছেন যে একটা নোংরা কালো নেংটি ইঁদুরের সাথে তাকে যেন জড়ানো না হয়।

মাননীয় মিস্টার থর্নডাইক এদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের একজন। তাঁর সাথে যারা বিরোধিতা করছে তাদের শাস্তি হওয়া আবশ্যক। আফ্রিকানরা কেবল বর্বরই নয়, মূর্খও বটে। নাহলে ওরা এসব শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে কথা বলতে পারে? সমস্ত আফ্রিকা জুড়ে ওরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে চলেছে। এখানে ওরা দু'মুঠো খেয়ে রয়েছে। তা বোধহয় ওদের পছন্দ নয়। যীশু এসব ইঁদুরদের ক্ষমা করুন।

আমরা কিন্তু ভারতীয় গুণ্ডাকে ক্ষমা করতে রাজী নই। এমন শাস্তি দেওয়া হোক্ যাতে গুণ্ডামীর শেষ হয়। এদেশ শান্তির দেশ—অশান্তি কোনওমতেই যেন বরদাস্ত করা না হয়।

প্রথম পৃষ্ঠার নীচের দিকে ডেভিসের ছবিসহ বিবৃতি বেরিয়েছে। বিবৃতি পড়বার আগে আমি ডেভিসের ছবি দেখে একচোট হেসে নিলাম। ঘটোৎকচ সাদা গেঞ্জি আর সাদা হাফ প্যাণ্ট পরেছে। পায়ে কেডস্, হাতে গলফ্ স্টিক। মুখে পাইপ। পাকা সাহেব—পাকা ব্যবসায়ী! এ ছবি দেখে যে মানুষটিকে বোঝা যায় সে কখনও আফ্রিকানদরদী হ'তে পারেনা। আমি মনোযোগ দিয়ে বিবৃতিটি পড়লাম—"কাল যে ভারতীয় গুণ্ডাটা মিস্টার থর্নডাইককে আক্রমণ করেছিলো সে বোধহয় যীশুর কৃপাতেই আমাকে বাদ দিয়েছিলো। আমি যখন ওকে গলা ধাক্কা দিয়ে অফিস থেকে বার করে দিয়েছিলাম তখন ওর ভেতর নোংরা কালো কুত্তার কেঁউ কেঁউ

ছাড়া অন্য কিছু থাকতে পারে তা বুঝতে পারিনি। ও যে একটা ডাঁহাবাজ গুণ্ডা তা যদি ঘুণাক্ষরে বুঝতে পারতাম তো দক্ষিণ আফ্রিকার সৎ নাগরিক হিসাবে আমি ওকে নিশ্চয়ই পুলিশে ধরিয়ে দিতাম।

এই প্রসঙ্গে আমি সমস্ত শুভানুধ্যায়ীর কাছে আবেদন জানাচ্ছি যে তারা যেন এই নোংরা গুণ্ডাটার সাথে আমার কোনও সম্পর্ক বার না করেন ও আগামী নির্বাচনে আমার পক্ষ ত্যাগ না করেন। আমি মিস্টার থর্নডাইকের দলভুক্ত—আগামী দিনেও তাই থাকবো। মিস্টার থর্নডাইকের সমর্থনে আমি যে আবার কাউন্সিলে ফিরে যাবো তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।"

জোরালো বিবৃতি সন্দেহ নেই। ভাবতেও খুব ভালো লাগলো যে একটা বদমাইশ ব্যবসায়ীর মুখোস আমি খুলে দিতে পেরেছি। আমি যে উদ্দেশ্যে এদেশে এসেছি তা বলবার সাহস ডেভিসের নেই। ওদিক থেকে আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারি।

কাগজটা ফেরৎ দিলাম। আমাকে এক কাপ চা আর দু'টো বিস্কুট খেতে দিয়েছিলো। এখানেই এরকম খাবার—জেলে গিয়ে কি জানি কি খেতে হবে। এবার একটা ছোট নোট হাত বদল হলো। আমি তাড়াতাড়ি পেট ভরেই খেয়ে নিলাম।

ঠিক আটটার সময় আমাকে ঘর থেকে বার করে নেওয়া হলো। এবার হাতে কড়া। আরও তিনজন আফ্রিকান কয়েদীর সাথে আমাকে জেলখানায় চালান দেওয়া হলো।

মাফেকিং জেল

পৃথিবীর বিভিন্ন জেলের দুর্নাম রয়েছে। ফ্রান্সের বাস্তিল দুর্নীতিরই নামান্তরমাত্র ছিলো। ফরাসী বিপ্লবের সময় রাজার অত্যাচারের সবচেয়ে বড়ো চিহ্ন হিসাবে বাস্তিলকেই প্রথমে ধ্বংস করা হয়। ইংল্যাণ্ডের টাওয়ার অব লণ্ডনে কতো নিরীহ নর-নারীকে মারা হয়েছে তার হিসেব নেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় রাশ্যার সাইবেরিয়ায় যেসব বন্দীকে পাঠানো হতো তারা বরফের মধ্যে কেবলমাত্র চট দিয়ে ঘর বানিয়ে থাকতো। ফলে, তাদের কেউই বেশিদিন বাঁচতোনা। সাইবেরিয়া তাই এক বিশাল জেল ছাড়া আর কিছুই ছিলোনা।

মাফেকিং জেল দেখে আমি ঘাবড়ে গেলাম। প্রায় মাইল-খানেক জায়গা জুড়ে দেয়াল। চারদিকে চারটে বড়ো টাওয়ার। তাতে দিনরাত পাহারাদার রয়েছে। রাত্রিবেলায় সার্চলাইট ফেলে চারদিকে নজর রাখা হয়।

আমাকে প্রথমে অফিসঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। তারপর একজন পাহারাদার "কিউ" ব্যারাকে নিয়ে গেল। আরও চারজন বন্দীর সাথে আমাকে থাকতে হবে। ব্যারাক মানে ছোট্ট টিনের ঘর। তাতে কাঠের তাক করা। অনেকটা আমাদের দেশের দুই টায়ার ট্রেনের কামরার মতো। একজন উপরে, একজন নীচে।

বাদবাকি চারজনই আফ্রিকান। কেউ ইংরাজী জানেনা। আমাকে দেখে ওরা প্রথমে ঘাবড়ে গেছিলো। কিন্তু আমার খবর জানতে পারার পর ওরা যেন দেবতাকেই হাতে পেয়েছে এমন

ব্যবহার করতে লাগলো। আমার সাথে আর যে ক'জন আফ্রিকান কয়েদী মাফেকিং জেলে এসেছে তারাই যে আমার মহান কীর্তির কথা রটিয়েছে তা বোঝা গেল। ঠিক দশটায় নাম ডাকা হয়। তারপর স্নান করে খাওয়া।

নাম ডাকার সময় বিরাট মাঠে সকলে গিয়ে দাঁড়ালাম। নাংওয়ানামাশালাকে বার করতে হবে। কান খাড়া করে রইলাম। এতো বড়ো জেলে মাত্র চার'শো সোয়া চার'শোজন বন্দী। একজন বন্দীকে বার করবার অসুবিধা নেই। কিন্তু এ কি? বন্দীদের যে নাম ধ'রে ডাকা হচ্ছেনা—নম্বর ধ'রে ডাকা হচ্ছে। আমি বিপদে পড়লাম। চুপি চুপি পাশের লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "ন্যংওয়ানামাশালা?" লোকটা আমার দিকে তাকিয়ে কোনও জবাব না দিয়ে সরাসরি পাহারাদারের কাছে গিয়ে কি যেন বললো। নাম ডাকা বন্ধ করে পাহারাদার আমার কাছে এসেই কোমরে বুট দিয়ে এক লাথি লাগালো। ব্যাপারটা প্রথমে বুঝতে পারিনি। কিন্তু একটা লাথি খেয়ে তৈয়ারী হয়ে রইলাম। পাহারাদারকে আর দ্বিতীয় লাথি মারতে হলোনা। সে তখন দশহাত দূরে গড়াগড়ি খাচ্ছে। এ দৃশ্য দেখে অন্যান্য পাহারাদাররা ছুটে এলো। হাতে রাইফেল, কোমরে রিভলবার। তারা আমাকে ঘিরে দাঁড়ালো।

আমার ভাগ্যে সেদিন কি ছিলো কে জানে? কিন্তু হঠাৎ লাইন থেকে যেন একজন দৈত্য বেরিয়ে এলো। অনেক লম্বা চওড়া আফ্রিকান দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কিন্তু এ যেন সবাইকেই হার মানায়। বয়স কিন্তু পঁচিশ-ছাব্বিশের
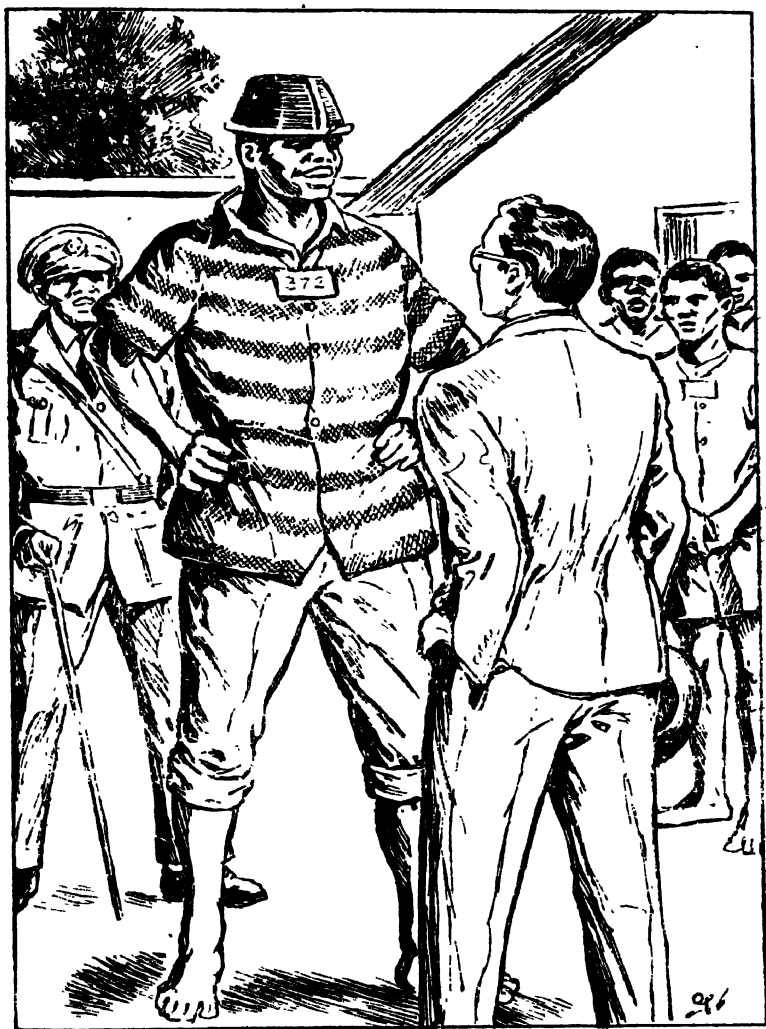
লোকটা বেশ সন্তুষ্ট হ'য়ে বললো, "হিয়েরেনিমো ? পেরুর হিয়েরেনিমো ?"

বেশি নয়। তাকে এগিয়ে আসতে দেখে পাহারাদাররা রাইফেল নামিয়ে নিলো। সে একটা পাহারাদারকে সরিয়ে দিয়ে আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলো, "তুমি কি বলেছিলে?" ইংরাজী কথা শুনে আমি চমকে গেলাম। পাকা সাহেবদের মতো ইংরাজী। তবে কি? আমার দেহ উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলো। আমি জবাব দিলাম, "নাংওয়ানামাশালাকে খুঁজছি। তাকে দেখিয়ে দেবার জন্য বলেছিলাম।" লোকটা মিনিটখানেক ধ'রে আমাকে দেখে বললো "আমিই নাংওয়ানামাশালা। তুমি কে?" আমি বললাম, "আমি ভারতীয়। হিয়েরেনিমো পাঠিয়েছে।" লোকটা বেশ সন্তুষ্ট হ'য়ে বললো, "হিয়েরেনিমো? পেরুর হিয়েরেনিমো?" আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম। নাংওয়ানা-মাশালা বললো, "বিকেল তিনটেয় তোমার ব্যারাকে যাবো। কোন ব্যারাকে আছো?" আমি বললাম। আবার লাইন হ'লো। নাম ডাকা হ'লো।

বিকেল ঠিক তিনটের সময় নাংওয়ানামাশালা এলো। সাতদিনের মাথায় যাকে মারা হবে এ যেন সেই লোক নয়। দিব্যি হাসিখুশী। আফ্রিকান পাহারাদাররা এর প্রতি যে সদয় তাতে কোনও সন্দেহ নেই। হাতে সিগারেট, কবজিতে ঘড়ি। ইংরাজী ভাষা আর কারুরই জানা নেই, আমি তাকে সব খুলে বললাম। বেশ মন দিয়ে সে সব কথা শুনলো। তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে সে বললো, "আজ ঝড় উঠবে। এখানকার ঝড় পর পর কয়েকদিন থাকবে, তারপর হয়তো বৃষ্টি নামবে। তুমি যদি আমাকে নিয়ে পালাতেই চাও তো বৃষ্টি

নামা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। আমি বললাম, "বৃষ্টি নামুক আর না নামুক, আমরা তিন দিনের মাথায় এখান থেকে পালাবো। আমি হিয়েরেনিমোর অপেক্ষায় রয়েছি। সব কাগজেই কালকের মারামারির কাহিনী ছাপানো হয়েছে। ডেভিসের স্বরূপ বেরিয়ে গেছে। হিয়েরেনিমো কোনও মতেই চুপ করে থাকতে পারবেন না। এই বুড়ো লোকটিকে আমি চিনি। খাঁটি সোনার থেকেও বেশি খাঁটি। কিন্তু মানুষের তো অসুখও হ'তে পারে। তাই কারুর ভরসাতেই থাকবো না। ঠিক তিনদিন বাদে পালাবো।"

আবার নাম ডাকার সময় হয়েছে। বিকেল ছ'টা বাজে। এর পর আর সারা রাত পাহারাদারদের ঝামেলা নেই। তবে সাতটার পর ডালকুত্তা ছেড়ে দেওয়া হয়। ওরাই পাহারা দেয়। কেউ বেরুলে আর রক্ষা নেই। মানুষকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলার শিক্ষা এসব কুকুরকে দেওয়া হয়েছে।

পরদিন সকালবেলায় অফিসঘরে আমার ডাক পড়লো। কে এক ডেভিড টিলইয়ার্ড আমার সাথে দেখা করতে এসেছেন। দশ মিনিট কথা বলবার জন্য দেওয়া হয়েছে। টিলইয়ার্ডকে দেখে আমি আনন্দে প্রায় হাততালিই দিয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু হিয়েরেনিমোর চোখের ইশারা বুঝতে বেশি অসুবিধা হলো না। হিয়েরেনিমো বেশ চেঁচিয়ে বললেন, "মিস্টার ব্যাণ্ডো ? আমি ডেভিড টিলইয়ার্ড। এঙ্গোলা থেকে এসেছি। ইংল্যাণ্ডের লইয়ার্স এসোসিয়েশন ফর ডিসট্রেসড্ পীপল-এর তরফ থেকে উকিল ঠিক করবার জন্য আপনার কাছে এসেছি।" আমিও

বেশ চেঁচিয়েই বললাম, "বাঃ, গ্র্যাণ্ড। উকিল অবশ্যই লাগবে। আমি দেশে ফিরে যেতে চাই।" "তাতো নিশ্চয়ই" হিয়েরেনিমো বললেন, "এই কাগজগুলি দেখুন। এতে উকিলদের নাম-ঠিকানা রয়েছে। যাকে হয় পছন্দ করুন। আমরা সব ব্যবস্থা করবো।" হিয়েরেনিমো একটা কাগজ বার করে দিলেন। তাতে লেখা—

কাল বিকেলে ছ'টার সময়
ঘটবে যখন মহাপ্রলয়
চারদিকেতে অন্ধকার
তখন এসো ঘরের বার
ভেতরে গান বাইরে শিস
গাছের নাম বাবলা-শিরীষ,
এক লাফেতে বেরিয়ে এসে
নদীর জলে যাওরে ভেসে
একটি মাইল গেলে পর
কালাহারির বালুর স্তর
অনেকগুলি উটের সারি
তারই মাঝে মোটর গাড়ি।

পড়া শেষ করে আমি বললাম, "মিস্টার টিলইয়ার্ড। এতোগুলি নাম আর তাদের কোয়ালিফিকেশন—একটু ভেবে দেখতে হয়। তা, কয়েকটা নাম কি আমি লিখে নেবো?" "তা নিন না, তা নিন না," হিয়েরেনিমো চেঁচিয়ে উঠলেন, "অতো ব্যস্ত হবার কি আছে?" আমি কাল সকালে আবার

আসবো, কেমন? ততোক্ষণে পাহারাদার ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। হিয়েরেনিমো চলে গেলেন।

গতকাল লক্ষ্য করেছিলাম যে বিকেল চারটা থেকে নাম ডাকা পর্য্যন্ত বন্দীরা খেলাধূলা অথবা পায়চারী করে। ঠিক তিনটের সময় নাংওয়ানামাশালা এলো। আমি ওকে সব খুলে বললাম। নানা গল্পগুজবের মধ্য দিয়ে সময় কাটিয়ে চারটের সময় আমরা দু'জনে বেড়াতে বেরুলাম। অন্ধকারে পাঁচিল টপকানো আদৌ কঠিন নয়। অশ্বত্থগাছটা ঠিক পাঁচিলের গা ঘেঁষে নয়—একটু দূরে। তার পাশ দিয়েই মোলোপো নদীর একটা শাখা বেরিয়েছে। বর্ষা আসছে—জলের তীব্রতাও তাই বাড়বে। কুমীর থাকাও অসম্ভব নয়। এরকম জায়গার প্রতিটি নদীতেই কুমীরের আস্তানা রয়েছে। এই নদীর শাখা দিয়ে সাঁতরে এক মাইল উত্তরে যেতে হবে। সেখান থেকে কালাহারির শুরু বলা চলে যদিও মরুভূমি বলতে যা বোঝায় সেই স্তরে স্তরে বালি ওখানটাতে নেই।

সে রাতটা নানা চিন্তাভাবনায় কেটে গেল। মাঝরাতে স্বপ্ন দেখলাম, বিরাট হাঁ করে একটা কুমীর আমাকে গিলতে আসছে। আমি তারস্বরে চীৎকার করে পালাতে চাইছি। কিন্তু তা পারছি না কারণ কে যেন আমাকে বরফ ছুঁড়ে মারছে। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। গা ঘামে ভরে গেছে। বরফের বদলে বড়ো বড়ো জলের ফোঁটা গায়ে পড়ছে। আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নেমেছে। ব্যারাকের টিন ভেদ করে ঝমঝম শব্দে বৃষ্টি পড়ছে। আফ্রিকানরা কিন্তু অঘোরে ঘুমোচ্ছে। সারাদিন ওরা বাগানের কাজ করে এখন নিতান্তই ক্লান্ত। আমি ধাক্কা দিয়ে ওদের তুলে দিলাম।

বৃষ্টির জন্যই বোধহয় রাত থাকতে আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিলো। আমি আর ঘুমোতে চাইলাম না। তা সম্ভবও ছিলো না কারণ বৃষ্টির জলে উপরের তাক ভেসে গিয়েছিলো ও তা থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে জল পড়ছিলো। হিয়েরেনিমোর দেওয়া কাগজটা আমি বার করে আবার দেখতে বসলাম। কিন্তু এপথে কতদূর যাওয়া সম্ভব তা বুঝলাম না। নাংওয়ানামাশালার কাছ থেকে একটা পুরোণো মানচিত্র আগেই নিয়েছিলাম। আবার তা নিয়ে বসলাম।

হিয়েরেনিমো বোধহয় সোজা উত্তরদিকে কালাহারি পার হবেন। তারপর গামি হ্রদ বাঁয়ে রেখে ও মাকারিকরি হ্রদ ডাইনে রেখে সোজা উত্তরে গিয়ে জাম্বিয়া যাবেন। কিন্তু এতে সময় লাগবে অনেক, কষ্টেরও অভাব থাকবে না। যাহোক, হিয়েরেনিমো নিশ্চয়ই সব ব্যবস্থাই করেছেন। তিনি বুদ্ধিমান লোক—যা করবেন তা ভালোর জন্যই।

বাইরে কুকুরের ঘেউ ঘেউ শোনা যাচ্ছে। কি অদ্ভুত জীব! ন্যায়-অন্যায় বোঝার ক্ষমতা নেই—প্রভুর আদেশই শিরোধার্য। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়লো—হাসিও পেলো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মানরা বলতো—আদেশ অবশ্যই পালন করতে হবে। আদেশ আদেশই থাকে। এই ধারণাই ওদের ধ্বংসের মূলে ছিলো। কিন্তু এখানকার কুকুর? ভালো কথা মনে পড়েছে। আমি আবার হিয়েরেনিমোর কাগজটা বার করে তাতে লিখলাম—

কুকুর তাড়াতে গেলে মরিচের গন্ধ
ডাক্তার বলে ওষুধটা নয় মন্দ।

রাতের স্বপ্নের ঘোর কেটে গেছে। বাইরে আলো ফুটে উঠেছে। আমি বৃষ্টির জলেই চোখ ধুয়ে নিলাম। কুকুরগুলোকে বোধহয় সরিয়ে নেওয়া হয়েছে কারণ তাদের ডাক আর শোনা যাচ্ছে না। তাহলেও এখন বাইরে গিয়ে কাজ নেই।

ঠিক আটটার সময় হিয়েরেনিমো আবার এলেন। আমি কাগজটা দিতেই তিনি তা দেখে উঠে দাঁড়ালেন। পাহারাদারের সাথে একটা নোট হাত বদল হ'তে দেখলাম। হিয়েরেনিমো বললেন, "আমি কি একে এক প্যাকেট বিস্কুট কিনে দিতে পারি?" পাহারাদার হাই তুলে বললো, "সাহেবদের জন্য এদেশের আইন নয়।" হিয়েরেনিমো ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন— "আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে আসছি।" পাহারাদার আমার কাছে একটা বই এনে দিলো। লেন ডেইটা-র লেখা "ফিউনার‍্যাল ইন্ বার্লিন।" হাসি পেলো। আমাকে যদি কেউ চিনতো তো সে হয়তো "ফিউনার‍্যাল ইন্ মাফেকিং" লিখতো। আজ সন্ধ্যার পর আর বেঁচে থাকবো কিনা কে জানে!

হিয়েরেনিমো ফিরে এলেন। হাতে মস্ত প্যাকেট। পাহারাদার এক এক করে দেখলো। পরীক্ষা করে নিতেই হবে। রিভলবার ধরণের কিছু ভেতরে চলে গেলেই বিপদ! বিস্কুট, কেক, পাঁউরুটি, মরিচ, একটা কনডেনসড্ মিল্কের টিন। এবার হিয়েরেনিমো নিশ্চিন্তমনে হেসে বললেন, "তাহলে উকিল ঠিক করেছেন?" আমি বললাম, "হ্যাঁ। তবে জাম্বিয়ার উকিলের থেকে মোজাম্বিকের উকিল কি ভালো হবে না?" হিয়েরেনিমো এক মিনিট ভাবলেন, তারপর হেসে বললেন, "না, না, ওভাবে উকিল ঠিক হয় না।

অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। যাহোক, আরেকটা দিন ভাবুন। আমি কাল আবার আসবো।” তিনি উঠে দাঁড়ালেন। আমি বললাম, “আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, মিস্টার টিলইয়ার্ড।” হিয়েরেনিমো হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেলেন।

সারাটা দিন ব্যস্ততার মধ্যে কেটে গেল। ঝমঝম করে বৃষ্টি। প্রচণ্ড ঝড় বয়ে চলেছে। এর মধ্যেই কিউ ব্যারাকে প্রায় পঁচিশজন আফ্রিকান গাদাগাদি করে বসেছে। কোনও পাহারাদার হঠাৎ এলে তাস আর দাবা খেলাই দেখতে পাবে। নাংওয়ানা-মাশালার অত্যন্ত অনুগত এই পঁচিশজন আফ্রিকানকে ওদের কর্তব্য ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়া হ'লো। নাম ডাকার পরই ঘরে ঘরে গান শুরু হবে। প্রথম বর্ষার আগমনী গান। এটা নতুন কিছু নয়। হয়তো কারুর ভালো লেগেছে। সে গান শুরু করলো। সেই গান ব্যারাকে ব্যারাকে ছড়িয়ে পড়লো। বছরের যে কোনও সময়েই এরকম ব্যাপার ঘটতে পারে। আজ সন্ধ্যায় এ গান কাউকেই অবাক করবে না। ছ'টার পাঁচ মিনিট আগে নাংওয়ানামাশালা আমার ব্যারাকে আসবে। বৃষ্টি থাকুক আর না থাকুক আকাশের যা অবস্থা তাতে ছ'টার সময় আলো থাকবে না। তারপর ভগবানের কাছে নিজেদের সঁপে দিতে হবে।

হাতে যেটুকু সময় ছিলো তাতে আমি ঘুমিয়ে নিলাম। হিয়েরেনিমোর দেওয়া খাবারের প্যাকেট ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে। মরিচের ঠোঙ্গাই কেবল অটুট রয়েছে।

পলায়ন

বিকেল সাড়ে পাঁচটাতে যথারীতি নামডাকা শেষ হলো। আমরা ব্যারাকে ফিরে গেলাম। অন্য বন্দীদের কাছ থেকে দু'জনে দুটো ট্রাউজার নিয়েছি। এগুলি কাজে লাগবে। ছ'টা বাজতে দশ মিনিট আগে ব্যারাকে ব্যারাকে গান শুরু হ'লো। কিন্তু এ কি? গানের আওয়াজ ছাপিয়েও কুকুরের ঘেঁউ ঘেঁউ শোনা গেল। তবে কি ওরা আজ আগেই কুকুর ছেড়ে দিয়েছে? নাংওয়ানামাশালার মুখের দিকে তাকালাম। সে কেবল মুচকি হাসলো। তারপর আমাকে বেরিয়ে যাবার ইশারা করলো। আমি মরিচের ঠোঙ্গাটা ওর হাতে দিলাম। নাংওয়ানামাশালা অন্ধকারে ছুটতে লাগলো। আমি ঠিক পেছনে। মিনিট দুয়েকের মধ্যে দেয়ালের কাছে চলে এলাম। নাংওয়ানামাশালা হাঁটু গেঁড়ে বসলো। তারপর ওর কাঁধে ওঠবার জন্য সে আমাকে ইশারা করলো। আমি বাধা দিতে যাচ্ছিলাম। তার আগেই নাংওয়ানামাশালা হিস্ হিস্ করে উঠলো, "কুইক, কুকুর আসছে।" আমি অন্ধকারে কিছু দেখতে পেলাম না। কিন্তু মনে হলো, একটা কুকুর যেন তারস্বরে অন্যদের ডাকছে। আর দেরী না করে আমি নাংওয়ানামাশালার কাঁধে চেপে দেয়ালে উঠলাম। আফ্রিকানদের গান যেন আরও জোরালো হয়ে উঠেছে। নাংওয়ানামাশালা বললো, "জলে ঝাঁপ দাও।" আমি লাফ দিলাম। সাঁতরে অনেকখানি এগিয়েও গেলাম। ঠাণ্ডা জল। অসম্ভব স্রোত। আমরা উত্তরে যাবো। স্রোত উল্টোদিকে

কিন্তু নাংওয়ানামাশালা কই? ওর তো কোনও সাড়া নেই। আমি কি এগিয়ে যাবো?

মিনিট দুয়েক বাদেই আমার পেছনদিকে ঝপ করে একটা আওয়াজ হ'লো। নাংওয়ানামাশালা এসেছে। সাঁতরে কাছে এসে সে বললো, "কুকুরটাকে তাড়াতে হলো। মেরে ফেললেই ভালো ছিলো। কিন্তু তাহ'লে ধরা পড়ে যেতাম। অনেক কায়দা করে গায়ের জামা খুলে মরিচ মাখিয়ে তা অন্যপাশে ছুঁড়ে দিয়ে পালাতে পেরেছি।" আমি বললাম, "এবার চলো। যতো তাড়াতাড়ি পারি সাঁতার কাটি।"

আগেই হিসাব ঠিক করা ছিলো। হাতে ঠিক ষোলো ঘণ্টা সময়। এর মধ্যে এদেশ ছেড়ে পালাতে হবে। মরুভূমিতে ঢুকলেই যে বিদেশে গেলাম তা নয়। মাইলের পর মাইল জুড়ে দক্ষিণ আফ্রিকার আধিপত্য। যক্ষুনি টের পাবে তক্ষুনি হেলিকোপ্টার আর মোটর গাড়িতে সৈন্য যাবে—মরুভূমিতে রক্তের বন্যা বইবে। হিয়েরেনিমো কেন যে এ পথ বেছে নিয়েছেন তা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

অন্ধের মতো চোখ বুঁজে সাঁতার কেটে চলেছি। নাংওয়ানামাশালার চোখ কিন্তু অন্ধকারেও আগুনের মতো জ্বলছে। আশ্চর্য দৃষ্টিশক্তি! প্রায় আধ ঘণ্টা লাগলো—অবশেষে এক মাইল পথ সাঁতরে পেরুলাম। নাংওয়ানামাশালা আমাকে টেনে তুলে মাটিতে শুইয়ে দিলো। আমার কোমরে তখন খুব ব্যথা। পাহারাদারের লাথিতে বেশ জোর ছিলো। এখন তা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি। নাংওয়ানামাশালাকে সে কথা

বলতে ও যেন ছেলেমানুষের মতো ব্যবহার করতে লাগলো। আমি যতো উঠতে চাই ততো সে বাধা দেয়। মুখে এক কথা, "এখানে বিশ্রাম নাও। আমার প্রাণ যাবে। তারজন্য তুমি প্রাণ হারাবে কেন?" প্রায় পনেরো মিনিট পর আমি উঠে দাঁড়িয়ে আবার বসে পড়লাম। নঃা, ব্যথা বাড়ছে। এবার নাংওয়ানামাশালা বিড়বিড় করতে লাগলো, "ধরা পড়লে এরও ফাঁসি হবে। পালানোই ভালো।" তারপর সে "ঠিক আছে" ব'লে এক ঝটকায় আমাকে কাঁধে তুলে নিয়ে দৌড়ুতে লাগলো। আমি হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে বাধা দিলাম। কিন্তু দৈত্য যাকে কাঁধে তোলে সে কি সহজে ছাড় পায়? এভাবে কিছুদূর যাবার পর আমি জ্ঞান হারালাম।

কতোক্ষণ এই অবস্থায় ছিলাম জানিনা। অনেকগুলি উটের আশ্চর্য ডাকে জ্ঞান ফিরে এলো। তখনও আমি নাংওয়ানামাশালার কাঁধে। আমি একটু আধটু শব্দ করতেই সে বললো, "তুমি বাঁচালে। এর আগে দু'বার মাটিতে নামিয়েছি। কোনও জ্ঞান ছিলো না। ওই দেখো, দূরে কাফেলা দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাঝখানে মোটর গাড়ি।" আমাকে কিছু বলার দরকার ছিলো না। আনন্দে মন নেচে উঠলো। শেষ পর্যন্ত কার্যোদ্ধার করেছি। আর মাত্র কয়েক হাত বাকি—হিয়েরেনিমো আমাদের দিকে ছুটে আসছেন। কিন্তু সঙ্গের বুড়োটা কে? আলভারেজ না? হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছি। আলভারেজই আমাকে নামিয়ে নিলেন—বাবা যেমন বাচ্ছা ছেলেকে উঁচু জায়গা থেকে নামিয়ে নেন ঠিক সেরকমভাবে। হিয়েরেনিমো মুখ কালো

করে নাংওয়ানামাশালার কাছ থেকে সব শুনলেন। তারপর গাড়ি থেকে ফার্স্ট এড বাক্স এনে আমাকে একটা ইন্‌জেকশন্‌ দিলেন। আলভারেজকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি আবার এই বিপদে এলেন কেন?" বৃদ্ধ হো হো করে হেসে বললেন, "দেনা শোধ করবার জন্য। পেরুর জঙ্গলে তুমিই তো আমাকে বাঁচিয়েছিলে।" তিনি গাড়ির চালকের আসনে বসলেন। আমাকে পেছন দিকে শুইয়ে দেওয়া হলো। হিয়েরেনিমোর কোলে আমার মাথা।

কাফেলাটা আমাদের সাথে যাবেনা। ওটাকে ভাড়া করা হয়েছিলো মোটর গাড়িটাকে ঢাকবার জন্য। চমৎকার বাঁধানো রাস্তা—মরুভূমি এলাকা দিয়ে চলেছি মনেই হয়না। গাড়ি সোজা উত্তর দিকে না গিয়ে উত্তর-পূব দিকে যাচ্ছে। আলভারেজ আর হিয়েরেনিমো সমান তালে বকবক করে চলেছেন। হিয়েরেনিমোকে খবর দেবার জন্যই আমি মারামারি করে জেলে গিয়েছিলাম। কাগজে সব পড়ে হিয়েরেনিমো আমার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি বৃদ্ধ। এক বৃদ্ধের মাথার চেয়ে দুই বৃদ্ধের মাথার দাম বেশি ভেবে তিনি আলভারেজকে খবর পাঠিয়েছিলেন। আলভারেজ তখন ছাদ রিপাবলিকের রাজধানী ফোর্ট লামিতে ছিলেন। তিনি একটা প্রত্নতাত্ত্বিক সম্মেলনের সভাপতিত্ব করছিলেন। খবর পেয়েই তিনি মাফেকিং-এ ছুটে আসেন। তারপর দু'জনে মিলে ভবিষ্যতের কর্তব্য ঠিক করেন। আমাকে অবাক করে দেবার জন্যই হিয়েরেনিমো আগে কিছু বলেননি।

ইনজেকশনের ফলে ব্যথা অনেক কমে গিয়েছিলো। মোটর গাড়ির ঝাঁকুনিতে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। কতোক্ষণ এই অবস্থায় ছিলাম বলা কঠিন। যখন ঘুম ভাঙ্গলো তখম রাত দশটা। আমার কোমরের ব্যথা একেবারেই নেই শুনে হিয়েরেনিমো নিশ্চিন্ত হলেন। গাড়ি তখন রেললাইনের সমান্তরালভাবে ছুটে চলেছে। আমরা লোবোৎসি, উৎসি, রামোৎসা পেরিয়ে গ্যাবেরোনসের মধ্য দিয়ে মম্বুডি পৌঁছেছি। এখানে রাস্তার একপাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে খাবার খেয়ে নিলাম। তারপর আর্টেসিয়া আর মামাবুলা পেরিয়ে গিয়ে একটা সাঁকোর কাছে গাড়ি থামলো। হিয়েরেনিমো এখানে সবাইকে গাড়ি থেকে নেমে যেতে বললেন। আমরা মালপত্রসহ নেমে যেতেই হিয়েরেনিমো গাড়িটার ইঞ্জিন চালু করে ঘড়ি ধ'রে দাঁড়িয়ে রইলেন। রাত তখন বারোটা। দূরে একটা ট্রেনের শব্দ শোনা গেল। হিয়েরেনিমো বললেন, "মাফেকিং যাবার শেষ ট্রেন।" একথা বলে তিনি গাড়িটাকে চালিয়ে দিলেন। খালি গাড়িটা এঁকেবেঁকে যক্ষুণি নদীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো ঠিক তক্ষুণি কয়েক ফার্লং দূরের আরেক সাঁকোর ওপর দিয়ে ট্রেনটা তীব্রগতিতে বেরিয়ে গেল। গাড়িপড়ার শব্দ শোনাও গেলনা।

গাড়িটা সম্পূর্ণ ডুবে যাওয়া পর্য্যন্ত আমরা অপেক্ষা করলাম। তারপর হিয়েরেনিমো বললেন, "এবার হাঁটা শুরু। প্যাডক ঠিক থাকলে হয়।" আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "প্যাডক, তিনি আবার কোথা থেকে এলেন?" হিয়েরেনিমো হেসে বললেন, "কান টানলেই মাথা। যেখানে আলভারেজ সেখানে প্যাডক। এতে অবাক হবার কি রয়েছে? প্যাডক পার্ৱী

রোড-এ টিকিট নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ওখানে পৌঁছুলেই ফ্রান্সিসটাউনের শেষ ট্রেন ধরতে হবে। সেখানে লঞ্চ ঠিক করা আছে। সাসী নদী ধ'রে লিম্পোপো নদীতে পড়বো। সেখান থেকে সোজা মোজাম্বিক। কালোমাণিক, তুমি ঠিকই ধরেছিলে। মোজাম্বিকের উকিলই আমার বেশি পছন্দ।" আমি হো হো করে হেসে উঠলাম। নাংওয়ানামাশালা এবার জোর-জবরদস্তি করেও আমাকে কাঁধে তুলতে পারলো না। তবে সে ছাড়বার পাত্র নয়। আমাকে সে একরকম টেনেই নিয়ে চললো। কিছুটা হেঁটে কিছুটা দৌড়ে আমরা যখন পাল্লা রোড-এ পৌঁছুলাম তখন ট্রেন স্টেশনে ঢুকছে। প্ল্যাটফর্মে প্যাডক অস্থির হয়ে পায়চারী করছেন। আমাকে দেখে তিনি জড়িয়ে ধরলেন।

ট্রেন প্রায় খালি। প্রত্যেক দেশের শেষ ট্রেনের মতো এটিও যে চোরাকারবারীদের জন্য তা একবার দেখেই বোঝা গেল। আমরা সবাই মিলে যখন শ্বেতাঙ্গদের কামরায় ঢুকলাম তখন টিকিট কালেকটার একবার হাই তুলেই বাঁ হাতে প্যাডকের দেওয়া নোটগুলি নিয়ে আবার ঘুমোতে লাগলো। একে একে মহালাপে, শোশোং, পালাপাই রোড, টোপসি পেরিয়ে ট্রেন যখন ফ্রান্সিসটাউনে পৌঁছুলো তখন সকালবেলার মুরগী ডাকতে শুরু করেছে।

বিভীষিকার দেশ ছেড়ে পালানোর জন্য আমাদের হাতে তখনও কয়েক ঘণ্টা সময় রয়েছে।

———